ইচ্ছামতী

শরত সংখ্যা ২০১১

সূচীপত্র

প্রথম পাতাঃ শরত সংখ্যা ২০১১.....1

প্রচ্ছদকাহিনীঃউতসব.....3

শরত এল.....3

দুর্গাপুজো 6

খুশির ঈদ.....11

মজার উৎসব হ্যালোউইন.....15

চেনা দেশ - অচেনা উৎসব : থ্যাঙ্কস্-গিভিং 20

মজার পাতা.....23

ছড়া-কবিতা.....25

কচি-কাঁচার প্রতি.....25

পক্ষীরাজ.....26

মিষ্টি মেয়ে দুষ্টু মেয়ে.....27

শারদ শুভেচ্ছা.....28

পরিবেশ.....29

মেঘ সূর্য্যের খেলা.....30

পুজোর ছুটি.....31

রঙে রঙে রঙীন.....32

সাত ছড়া.....33

গল্প-স্বল্প.....34

পটলবাবুর বিজ্ঞানচর্চা.....34

অদ্-ভূত প্রতিশোধ.....41

সব পেয়েছির দেশে.....48

মিষ্টি নিমপাতা.....51

দ্রাঘিমাংশ.....57

ক্র্যাশ-কোর্স.....61

রাজা ও রানী.....71

ছুটি আর ছুটির মন.....78

বিদেশী রূপকথা: কুকুর কেন বিড়ালকে অপছন্দ করে.....80

পড়ে পাওয়া: বুড়ো আংলার সন্ধানে.....90

পুরাণকথা: কি করে রাত্রি এল.....92

স্বাধীনতার গল্পঃ পর্ব ৫.....95

বায়োস্কোপের বারোকথা: বাংলা ছবির নতুন পরিচালকেরা.....98

ছবির খবর: কুং-ফু প্যান্ডা ২.....100

দেশে-বিদেশে: ঈশ্বরের বাসভূমি গাড়োয়াল.....103
পরশমণি.....108
শুঁয়োপোকার কথা.....108
কলেরা গবেষণায় দুই বাঙালির অবদান.....113
জানা-অজানা.....116
পাখি উড়ে গেল কবে.....116
সাবধান! চোরাবালি!.....124
আঁকিবুকি.....128

প্রথম পাতাঃ শরত সংখ্যা ২০১১

এই সময়টা বেশ অন্যরকম। বছরের অন্য সময়ের তুলনায় অনেক বেশি ঝকঝকে নীল আকাশ। সেই আকাশে ভেসে যাচ্ছে সাদা সাদা তুলোর মত মেঘ। কখনও বা আকাশ হটাত ঢেকে যাচ্ছে জল ভরা ধূসররঙা নাছোড় মেঘে। এক-দুই পশলা বৃষ্টি ঝুপঝুপ করে এসে ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে গাছপালা, পথ ঘাট। সে মেঘ সরে গেলে নীল আকাশে ঝলকাচ্ছে সোনালি রোদ্দুর। এ রোদ অনেক নরম, অনেক মায়াময়। নীল-সোনালি- সাদা-সবুজ মিলিয়ে যে ছবি আঁকছেন প্রকৃতি মা, সেই ছবি দেখেই মন আনন্দে থই থই করে উঠছে। সে ছবি যেন ডেকে ডেকে বলছে- এসেছে ছুটির সময়, এসেছে উতসবের সময়, এসেছে আনন্দ করার সময়। এসেছে শরত।

হ্যাঁ, এসেছে শরত। এসেছে বাঙালির সবথেকে বড় উতসব শারদীয়া দুর্গাপুজো। দুর্গাপুজোর পেছনে পেছনেই আসছে লক্ষ্মীপুজো, দীপাবলী ও কালীপুজো, ভাইফোঁটা...তার ও পরে শীতের মুখে আছে নবান্ন। কিন্তু এই শরতে উতসব কি শুধু বাঙালিদের বা বাংলাদেশেই? একদমই না। এই তো কিছুদিন আগে হয়ে গেল মারাঠিদের সবথেকে বড় উতসব গণপতির পুজো; কেরালায় হয়ে গেল শস্যকাটার উতসব ওনাম। মুসলিম ধর্মের মানুষদের আনন্দের উতসব ঈদ পালিত হল তার পাশাপাশি। আর আমাদের দুর্গাপুজোর সাথে সাথেই অনুষ্ঠিত হবে উত্তর ভারতীয়দের নবরাত্রি; দীপাবলীর রাতে আলোর উতসব পালিত হবে প্রায় সারা দেশ জুড়ে। পাশাপাশি এই সময়েই অসমে পালিত হবে ধান চারা রোপণ উতসব- কাটি বিহু। ওদিকে পশ্চিমের দেশগুলিতে আর কিছুদিনের মধ্যেই পালিত হবে হ্যালোউইন আর থ্যাঙ্কস্‌গিভিং।

পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের মানুষেরা সবাই সারা গ্রীষ্ম, বর্ষা খাটাখাটনি করে, ফসল ফলিয়ে, শরতে সেই ফসল সঞ্চয় করে প্রস্তুতি নিচ্ছে শীত আসার, উতসব আনন্দ করে বিদায় জানাচ্ছে গ্রীষ্মকে, আরাধনা করছে প্রকৃতির অফুরন্ত দানের। দক্ষিণ গোলার্ধ সবে শীত ছেড়ে গ্রীষ্মে পা দিচ্ছে। সেখানে এখন বসন্ত। শীতের অবসানে, গ্রীষ্মের আগমনে সেখানে জীবন নতুনের আনন্দে ভরপুর। সেখানে পালিত হচ্ছে বসন্তের উতসব।

তাই এই উতসবের মরসুমে, ইচ্ছামতী সেজে এল নতুনভাবে - তোমার জন্য নতুন প্রচ্ছদকাহিনী নিয়ে। শরত সংখ্যা ২০১১ থেকে ইচ্ছামতী শুরু করছে নতুন বিভাগ -প্রচ্ছদকাহিনী। আর আমাদের প্রথম প্রচ্ছদকাহিনী - অবশ্যই- 'উতসব'। বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের নানারকমের উতসব পালন নিয়ে থাকছে

বেশ কয়েকটি লেখা। রয়েছে দুর্গাপুজো, ঈদ, থ্যাঙ্কস্‌গিভিং আর হ্যালোউইন নিয়ে নানারকম তথ্যে ভরপুর সব লেখা। লেখাগুলি পড়তে পড়তে দেখবে, কিরকমভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষদের একই সময়ে পালিত হওয়া উতসবগুলি অনেক ক্ষেত্রে একইরকম ভাবনা থেকে শুরু হয়। তাই আমাদের ভূত চতুর্দশীর সাথে কোথায় যেন মিল খুঁজে পাই হ্যালোউইনের, আর নবান্ন উতসবের সাথে মিলে যায় থ্যাঙ্কস্‌গিভিং উতসব পালনের ভাবনা।

প্রচ্ছদকাহিনী ছাড়াও রয়েছে অনেক গল্প, অনেক ছড়া আর অন্যান্য নিয়মিত বিভাগগুলি। এই পুজোর ছুটিতে, ঠাকুর দেখার ফাঁকে ফাঁকে অবশ্যই পড়ে ফেল নতুন ইচ্ছামতী শরত সংখ্যা ২০১১।

তোমার এবং তোমার পরিবারের পুজো খুব ভাল কাটুক।

চাঁদের বুড়ি
২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০১১
৯ই আশ্বিন, ১৪১৮
মহালয়া

প্রচ্ছদকাহিনীঃউতসব

শরত এল

বর্ষা সবে শেষ হল। এবার মেঘরাজ্যে ভারী খাটুনি গেছে আগের বারের তুলনায়।

আগের আগের বার মেঘেদের খুব মজা ছিল। কাগজে কলমে বর্ষাকাল এসে গিয়েছিল কিন্তু বড়কর্তার প্ল্যান ছিল খালি ভয় দেখাতে হবে, জল ঢালা নয়। কিঞ্চিৎ গণ্ডগোল অবশ্য পাকিয়েছিল মেঘেদের কালো-কোলো ছানাগুলো; তারা তো এত মতলবের কথা জানেনা – কাজের সময় এসে গেছে, তাই তারা কোন এক জায়গার আকাশে গিয়ে ভীড় জমাল। ছোট তো, তাই উৎসাহ বেশি। সবাই ভাবল, "বাবা, আকাশ এতো কালো হয়ে গেল। এইবার নামবে জব্বর বৃষ্টি।" কড়-কড়-কড়াৎ- মেঘের ছানাগুলি বেজায় মারামারি শুরু করল, এক্কেবারে বজ্র নিয়ে লাঠালাঠি। তাই দেখে চাষীরা হাল-বলদ নিয়ে মহা আনন্দে মাঠে নেমে পড়ল চাষ করতে। কিন্তু ওমা! বড়কর্তার প্ল্যান-এ জল ঢালা, মানে আদেশ অমান্য করেই জল ঢালা, কি এতই সহজ? ঊনপঞ্চাশ পবনের বাহিনী এসে এমন ফুঁ লাগাল যে মেঘেরা পালিয়ে যাবার পথ পায় না। কোথায় বৃষ্টি, কোথায় কি, আকাশ ফর্সা।

এদিকে এইরকম কিছু ঘটলেই রাজা মিহিরকিরণের হয় বেজায় রাগ। মেঘলা দিনে তাঁর মনে একটু আশা জাগে, প্রতিদিন সারাদিন একটানা কাজ করতে হয়, সেই দিনগুলো একটু বিশ্রাম করা যাবে। হা হতোস্মি! সেদিন যেমন, মোটে রথ ঘুরিয়ে দু'মাইল গেছেন কি যাননি, আকাশ ফর্সা দেখে তাঁকে আবার রথ নিয়ে ছুটতে হল। বিধাতাপুরুষ বলে দিয়েছেন আকাশ খালি রাখা যাবে না। সে কথা তো আর অমান্য করা চলে না! রেগে মেগে তিনি ভীষণ তেজে জ্বলতে লাগলেন। রোজই প্রায় এক গল্প। পৃথিবীর মানুষ হতাশ হয়ে পড়ল। মাটি ফেটে চৌচির, সব ফসলের বীজ শুকিয়ে নষ্ট হয়ে গেল। চাষীরা হায় হায় করে মাথায় হাত দিয়ে বসল। এই ভাবেই কেটেছে গত বছর দু'য়েক।

কিন্তু এবার? বছরের প্রথমেই মেঘদের হাতে বড়কর্তা, যার নাম শ্রী বাসব, একটা তালিকা ধরিয়ে দিয়েছেন। সেটা দেখে সব মেঘেদের ভুরু গেল কুঁচকে। এবার এত আগে থেকে কাজ শুরু করতে হবে! ব্যাপার কি? একজন বলল, "আরে জাননা, গত পূজার সময় দুগ্‌গা মা তো হাতিতে চড়ে গিয়েছেন। পঞ্জিকাতে লেখা আছে না, গজে চ জলদা দেবী শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা? বোধহয় সেই জন্যই।" আরেকজন বলল, "ছাই, এসব আবার কেউ মানে নাকি? এগুলো ফালতু কথা। আসলে কি হয়েছে জানো? পরপর কয়েক বছর এতো খরা গেছে যে মানুষ এখন আর বিরক্তও হচ্ছেনা। বরং বিজ্ঞানীরা

চেষ্টা করছেন যাতে নকল জলভরা মেঘ তৈরী করে ইচ্ছামত বৃষ্টি ঝরানো যায়। কেমন মজা হবে বলতো? যখন দরকার হবে তখনই বৃষ্টি পাওয়া যাবে। এসব শুনে বড়কর্তা শ্রী বাসবের ভয় ধরেছে না?"

কথাটা খুব একটা ভুল বলেনি। শ্রী বাসব-এর বেজায় ভয় ধরেছে বটে। এত বছর ধরে তাঁর হাতে বৃষ্টি ঝরানোর ভার; এজন্য তাঁর কি প্রতাপ! সবাই তাঁকে বেশ সমীহ করে। আজ যদি এইসব ক্ষমতা চলে যায় তো লোকে কি তাঁকে আর মানবে? তাই এবছর প্রথম থেকেই তিনি বেশ সক্রিয় হয়েছেন। রীতিমত আটঘাট বেঁধে কাজ শুরু করিয়েছেন। মেঘদের তো আর এত চিন্তাভাবনা করার অভ্যেস নেই; তাদের বলা হয়েছে, আর তারাও জল ঢালতে শুরু করল। ফলে, এবার এতো বৃষ্টি হল যে চারদিক ভেসে গেল, রীতিমত বন্যা শুরু হয়ে গেল। তার ওপর অতিবৃষ্টিতে বাঁধ ভেসে যাচ্ছে দেখে সেখান থেকে জল ছাড়া হতে লাগল। ফলে মানুষের ত্রাহি মাং অবস্থা। আর কেউ বৃষ্টি চায় না। সকলের জীবন পচে গেল একেবারে।

তারপর একদিন এই লাগাতার বৃষ্টি থামল। মিঃ বাসব খুশমেজাজে গোঁফে তা দিয়ে নিজের মনেই হাসলেন, ভাবলেন, "কেন, এইবার ব্যাটারা বোঝ, কত ধানে কত চাল! আমার নামে অভিযোগ করা? আমি নাকি কাজে ফাঁকি দেই!" তিনি মনের খুশীতে পেল্লাই এক ডিনারের অর্ডার দিলেন। তাই দেখে মেঘেরা গেল বেজায় চটে। "ই---স, আমাদের নাওয়া খাওয়ার সময় ছিল না, সারা দেশ জুড়ে দৌড়ে দৌড়ে ঘড়া ঘড়া জল ঢালতে ঢালতে হাত পায়ের খিল খুলে গেল। একদিনও তো দেখতেও যাননি, আমরা কিভাবে কেমন কাজ করছি। আজ এখন সেলিব্রেট করতে ডিনার খেতে বসেছেন। যত্তোসব!" তারা গজগজ করতে লাগল। তাই আকাশ একটু হাল্কা হলেও মেঘের গুরু গুরু বন্ধ হলনা।

ভারী বর্ষাটা কেটে গেছে। তা বলে সমস্ত মেঘের কাজ কিন্তু একেবারে শেষ হয়ে যায় নি। মাঝে মাঝে এখানে সেখানে জল অল্প-স্বল্প জল ঢালার কাজ চলতেই থাকবে – বড়কর্তার হুকুম জারি হয়ে গেছে। এখন এই কাজটা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবার পালা। ছোট দলের লীডাররা এই কাজের ভার ফেলল দলের পুঁচকিগুলোর ঘাড়ে। তারা হৈ হৈ করে আজ এখানে কাল সেখানে জল ছড়িয়ে বেড়াতে লাগল। পৃথিবীর মানুষ হয়তো রোদ দেখে মহা আনন্দে পুজোর বাজার করতে বেড়িয়েছে, বা ছোটরা কলকল করতে করতে এ দোকান ও দোকানে রঙবেরঙ-এর জামা জুতো খুঁজছে। হঠাৎ আকাশ থেকে ফুলঝুরির মত বৃষ্টি ঝরে পড়ল। ছোট্, ছোট্, মূহুর্তে রাস্তা ফাঁকা। তাই দেখে উপর থেকে বালখিল্য মেঘের দল হেসেই কুটিপাটি, আর মানুষেরা ভুরু কুঁচকে ওপর দিকে তাকাবার আগেই ভ্যানিস। কোথায় মেঘ, কোথায় বৃষ্টি, নীল আকাশ ঝকঝক করছে।

আর গাছপালারা? তাদের মন যে কী খারাপ হয়েছিল এতো বৃষ্টি দেখে। এখন ফাঁকা মাঠে যেখানে সেখানে কাশবন গজিয়ে উঠল। পূর্ণিমা রাতে জ্যোৎস্না গায়ে মেখে বাতাসের ছোঁওয়া পেয়ে আনন্দে একে অন্যের গায়ে হেসে ঢলে পড়তে লাগল। বাতাস সেই আনন্দ বয়ে নিয়ে গেল মানুষের বাড়ি। সবাই খুশি হয়ে উঠল। এদিকে কুমোরপাড়ায় কি ব্যস্ততা! বৃষ্টিতে প্রতিমা যে শুকায় নি। এখন দ্রুতহাতে প্রতিমা শুকিয়ে তারা রঙ লাগাতে ব্যস্ত। দুগ্‌গা ঠাকুর যে আজকাল বিদেশেও পাড়ি দেন। আর দু'দিন বাদেই ঢাকে কাঠি পড়বে। ঢ্যাম কুড়কুড়, ঢ্যাম কুড়কুড়, দুগ্‌গা ঠাকুর আর কত দূর। বর্ষার সমস্ত ঘ্যানঘ্যানে কষ্ট কাটিয়ে আকাশে বাতাসে আজ একটাই সুর বাজছে শরৎ এলো, শরৎ এলো।

শুক্তি দত্ত
বৈষ্ণবঘাটা, কলকাতা

দুর্গাপুজো

দুর্গাপুজো। বাঙালিদের সব থেকে বড় আনন্দ উতসব। হ্যাঁ, আনন্দ উতসবই লিখলাম, কারণ আজকের দিনে, দুর্গাপুজো আর শুধুমাত্র ধর্মীয় উতসব নয়। আর দুর্গাপুজোতে শুধুমাত্র বাঙালি হিন্দুরাই অংশগ্রহণ করেন না বা আনন্দ উপভোগ করেন না। আলো-মন্ডপ-প্রতিমা দেখা-বেড়ানো-খাওয়াদাওয়া-গান বাজনা- সব মিলে দুর্গাপুজো জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের কাছে হাসি-আনন্দে ভরা পাঁচটা দিন।

এই শরতকালে দুর্গাপুজো কেন হয় সেই নিয়ে সবথেকে প্রচলিত গল্পটা বোধ হয় সবার জানা। রাবণকে বধ করে সীতাকে উদ্ধার করার জন্য রামের প্রয়োজন ছিল দেবী দুর্গার আশীর্বাদের। কিন্তু দুর্গাপুজো আদতে হত বসন্তকালে (সে পুজো পরিচিত বাসন্তী পুজো নামে)। তাই রামচন্দ্র শরতকালে দেবীর অকালবোধন করতে বসলেন। তাঁর আরাধনায় খুশি হয় দেবী দেখা দিলেন। মূল রামায়ণে কিন্তু এই গল্পটা ছিল না। এই গল্পটা জানা যায় প্রধাণতঃ কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে।

শরতকালে দুর্গার আরাধনার আরেকটাও প্রচলিত গল্প আছে। হিমালয় কন্যা পার্বতী/ উমা তো

শিবঠাকুরকে বিয়ে করে কৈলাশ পর্বতে চলে গেলেন। কিন্তু তিনি বাপের বাড়ি না এলে কি হয়? তাই বছরে একবার, বর্ষার শেষে গোলাভরা ধান উঠলে, নতুন ফসল উঠলে, উমা তাঁর চার ছেলেমেয়েকে নিয়ে চার দিনের জন্য বাপের বাড়ি আসেন। কৃষিপ্রধান পূর্ব ভারতে যেভাবে ঘরে ভাল ফসল উঠলে বিবাহিতা মেয়েরা বছরে একবার বাপের বাড়ি বেড়াতে আসেন, ঠিক সেইভাবে।

কিন্তু যে দুর্গাঠাকুরের মূর্তি আমরা সাধারণতঃ মন্ডপে মন্ডপে দেখতে পাই, সেখানে তো বাড়ির মেয়ে উমা অথবা রামের আরাধনায় তুষ্ট দুর্গা দেবীকে দেখি না। আমরা দেখি দেবী দুর্গার মহিষাসুরমর্দিনী রূপ। দেবীর এই রূপের খোঁজ পাওয়া যায় পুরাণের আরেক গল্পে। সেই গল্প এইরকমঃ

এক খুব ভয়ানক অসুর ছিল। সে মহিষ সেজে ঘুরে বেড়াত, তাই সে পরিচিত ছিল মহিষাসুর নামে। মহিষাসুরের অত্যাচারে দেবতাদের দুঃখ দুর্দশার শেষ ছিল না। তাঁরা একশো বছর ধরে তার সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহিষাসুর দেবতাদের হটিয়ে দিয়ে নিজেই স্বর্গে ইন্দ্রের স্থান গ্রহণ করল। দেবতারা তখন নিরুপায় হয়ে ব্রহ্মাকে সাথে নিয়ে শিব ও বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। তাঁদের মুখে মহিষাসুরের অত্যাচারের কথা শুনে শিব আর বিষ্ণু প্রচন্ড রেগে গেলেন। রাগের চোটে ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বরের শরীর থেকে এক অদ্ভূত তেজ নির্গত হতে থাকল। আগুণের পাহাড়ের মত সেই পুঞ্জিভূত তেজ ক্রমশঃ একত্রিত হয়ে এক বিশাল দেবীর সৃষ্টি হল। সেই দেবী অপরূপ সুন্দরী;অমিত শক্তির অধিকারিনী। সেই দেবীকে দেখে দেবতাদের আনন্দের সীমা রইল না। তাঁরা কেউ তাঁকে দিলেন অস্ত্র,

কেউ বর্ম, কেউ অলঙ্কার। স্বয়ং হিমালয় এক বিশাল সিংহকে এনে তাঁকে বাহন রূপে উপহার দিলেন।

এই দেবী হলেন দুর্গতিনাশিনী দুর্গা। তাঁর হাজার হাজার হাত, তাঁর যুদ্ধহুঙ্কারে দশদিক কম্পিত হল। অসুরেরা সেই হুঙ্কারের শব্দে ছুটে এল। তারপরে শুরু হল এক ভয়ানক যুদ্ধ। মহিষাসুর এসে দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করল। সে ছিল এক দক্ষ মায়াবী। সে কখনও মহিষ, কখনও সিংহ, কখনও হাতি সেজে দেবীর সাথে লড়াই করতে লাগল। শেষ অবধি দেবী সেই মহিষরূপী অসুরকে ত্রিশূল দিয়ে আঘাত করে সেই মহিষের মুন্ডচ্ছেদ করলেন। তখন সেই অসুর আধখানা মহিষের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে যুদ্ধ করা শুরু করল। শেষ পর্যন্ত দেবী তার মাথা খড়্গ দিয়ে কেটে ফেললেন। দেবতারা দেবীর জয়ধ্বনি দিলেন। স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল। দেবী দুর্গা দেবতাদের কথা দিলেন আবার বিপদে পড়লে তিনি তাঁদের রক্ষা করতে আসবেন। এই বলে আকাশে মিলিয়ে গেলেন।

এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছ, আমরা যে দেবী দুর্গার প্রতিমা দেখে অভ্যস্ত, সেখানে আধাখানা মহিষের দেহ থেকে বেরিয়ে আসা অসুরকে কেন দেখা যায় দেবী দুর্গার পায়ের তলায়। দেবী দুর্গার সাথে মহিষাসুরের এই যুদ্ধের অসাধারণ এক বিবরণ শুনতে পাওয়া যায় মহালয়ার ভোরবেলায় রেডিওতে ভেসে আসা "মহিষাসুরমর্দিনী " অনুষ্ঠানে। শুনেছ নিশ্চয় মহালয়ার ভোরে?

একচালা প্রতিমা

এই সমস্ত গল্পই মিলে মিশে আছে আশ্বিনমাসের দেবীপক্ষে (বা শুক্লপক্ষে) পাঁচদিন ধরে দেবী দুর্গার আরাধনার মধ্যে। তাই প্রচলিত বিভিন্ন গল্পগুলি মিলে মিশে গিয়ে, আমরা এই মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার দুইপাশে দেখতে পাই তাঁর চার ছেলে মেয়েকেও।

শরতকালে দেবী দুর্গার আরাধনা বাঙালিদের মধ্যে চলে আসছে কয়েক হাজার বছর ধরে। এগুলি বেশিরভাগই ছিল পারিবারিক পুজো বা একা কোন মানুষের চেষ্টায় পুজো। দুর্গাপুজোকে আমরা এখন

যেভাবে দেখি, অর্থাৎ অনেক মানুষ মিলে একত্র হয়ে একটা পুজোর আয়োজন করা, উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে সেটা প্রথম শুরু করেন গুপ্তিপাড়ার বারো জন ব্রাহ্মণ মিলে। বারো জন বন্ধু বা 'ইয়ার' মিলে এই পুজো শুরু করেন বলে এই ধরণের পুজো পরিচিত হয় 'বারোয়ারি' পুজো নামে। 'বারোয়ারি' শব্দটি এখন আর তত ব্যবহার হয়না। তার বদলে ব্যবহার করা হয় 'সার্বজনীন শব্দটি। 'সার্বজনীন' অর্থাৎ সবাইকে নিয়ে যে পুজো।

হ্যাঁ, তাই এই লেখার শুরুতে বলেছিলাম, দুর্গাপুজো শুধুমাত্র বাঙালি হিন্দুদের এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এ হল সব মানুষের এক আনন্দ উতসব। আর আজকাল তো এই পুজো শুধু পুজোতেই সীমাবদ্ধ নেই। বিশেষ করে বড় শহরগুলিতে, অঞ্জলি, সন্ধিপুজো, ধুনুচি নাচ, ঢাকের বাদ্যি, এ সবের পাশেপাশে রয়েছে প্রতিমা, মন্ডপ, আলোকসজ্জার অসাধারণ সব উদাহরণ দেখতে পাওয়ার সুযোগ। কয়েক মাস ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে দূর দূরান্ত থেকে আসা শিল্পীরা সৃষ্টি করেন অসাধারণ সব মন্ডপ আর প্রতিমা। সেইসব নিয়ে বিভিন্ন পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা চলে। আর সুন্দর শিল্পকীর্তি দেখতে কার না ভাল লাগে? তাই এইসব শিল্পকীর্তি দেখতে ভিড় জমান সমাজের সব স্তরের মানুষ। এই ভাবে ধর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে এই উতসব হয়ে উঠেছে এক সামাজিক-সাংস্কৃতিক উতসব।

আর তোমার মত ইচ্ছামতীর ছোট্ট বন্ধুদের কাছে দুর্গাপুজো মানে তো লম্বা ছুটি, পড়াশোনা বন্ধ, নতুন জামা, দেদার মজা, যত ইচ্ছা ভালমন্দ খাওয়া। বাবা-মায়েদের শাসন ও অনেক কম এই কয়টা দিনে। অনেকদিন দেখা না হওয়া আত্মীয়দের সাথে দেখা হয়ে আড্ডা-গল্পে মেতে ওঠেন তাঁরা। ষষ্ঠী থেকে নবমী অবধি চারদিন ধরে চলে অফুরন্ত আনন্দ। আজকাল অবশ্য এত এত ঠাকুর দেখার সুযোগ, যে ভিড় শুরু হয়ে যায় চতুর্থী -পঞ্চমী থেকেই।

সন্ধিপুজোর ১০৮ বাতি

নবমী নিশি পোহালেই কিন্তু মায়ের ফিরে যাওয়ার সময় চলে আসে। দশমী দুপুরে মা দুর্গাকে সিঁদুর পরিয়ে, মিষ্টিমুখ করিয়ে বিদায় জানানো হয়। ঢাকে বেজে ওঠে বিদায়ের সুর-

ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ-
ঠাকুর যাবে বিসর্জন।

কিন্তু বিসর্জন দিলেই বা কি? সেই যে, মা দুর্গা দেবতাদের কথা দিয়েছিলেন, ডাক দিলেই তিনি ফিরে

আসবেন, সে আশাতেই বুক বেঁধে কিন্তু মা'কে নদীর জলে ভাসান দিতে দিতে সবাই হেঁকে ওঠে – 'আসছে বছর আবার হবে'। শুরু হয় আবার এক বছরের অপেক্ষা।

মহাশ্বেতা রায়
পাটুলি, কলকাতা

দুর্গার ছবিঃ
কৌস্তুভ রায়

গণেশজননীর ছবিঃ
সাবেরী সেনগুপ্ত

ফটোগ্রাফঃ
কল্লোল লাহিড়ি

খুশির ঈদ

কিছু আনন্দ কেবল অনুভবের। সে আনন্দ যতটা মনে অনুভব করা যায় ততটা লিখে ঠিক প্রকাশ করা যায় না। ঈদ তেমনই একটা আনন্দ। মুসলমানদের জন্য ধর্মীয় এই মহাউৎসব শুধু যেন উৎসব নয়, এ এক মহামিলনের দিন। আমরা জানি সব ধর্মেই নানারকম ধর্মীয় উৎসব পালন করা হয়। ইসলাম ধর্মেও ঠিক সেরকম উৎসব হল ঈদ। ঈদ এলে সকল দুঃখকষ্ট ভুলে ঈদের আনন্দে সমাজের সকলের সাথে আমরা মিলিত হই। এ আনন্দের উৎস কোথায়? উৎস মনে, উৎস হৃদয়ে। এই বিশেষ দিনটিতে সকলরকম ভেদাভেদ ভুলে ছোট-বড় সকলে মেতে ওঠে আনন্দে। ঈদের সকালে ঈদগাহে গিয়ে ঈদের নামাজ পড়ে একে অন্যকে কোলাকুলি করে ঈদ মুবারক বলে শুভেচ্ছা জানানো হয়। ঘরে ঘরে তৈরী হয় সেমাই, পায়েস, ফিরনী, পোলাও, কোরমা, বিরিয়ানীর মত সুস্বাদু সব খাবার। একে অপরের বাড়ি গিয়ে কুশল বিনিময় করে। মোট কথা নতুন জামাকাপড়ে, সুস্বাদু খাবারে, হাসিআনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে সমাজের ধনী-গরীব একত্রিত হয়ে আমরা ঈদের বিশেষ দিনটি পালন করি।

ঈদ শব্দটি আরবী ভাষা থেকে এসেছে। এর অর্থ খুশি, আনন্দ, আনন্দোৎসব ইত্যাদি।

ইসলাম ধর্মে এই ঈদ দুটো। ঈদুল ফিতর আর ঈদুল আজহা। ইসলাম ধর্মে চাঁদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে চান্দ্রমাস নির্ধারণ করা হয়। প্রতিবছর চাঁদের হিসেবে দেখা যায় এই ঈদ পনের দিন করে এগিয়ে আসে। যে কারণে প্রতিবছর একই দিনে ঈদ হয় না। বাংলা বা ইংরেজী বছরে আমরা বার মাসের নাম নিশ্চয়ই জানি! আরবী বছরেও ঠিক তেমন বার মাস রয়েছে। আমরা প্রথমে জেনে নিই আরবী মাসের নামগুলো।

আরবী বারো মাসের নাম

১) মহররম ২) সফর ৩) রবিউল আউয়াল ৪) রবিউস সানি ৫) জমাদিউল আউয়াল ৬) জমাদিউস সানি ৭) রজব ৮) শাবান ৯) রমজান ১০) শাওয়াল ১১) জিলক্বদ ১২) জিলহজ্ব
এই যে আরবী মাসের নবম মাসটির নাম রমজান, এই রমজান মাসটি রোজা রাখার মধ্য দিয়ে পালিত হয়।

তাহলে রোজা কি?

রোজা

সূর্য ওঠা থেকে সূর্য ডোবা পর্যন্ত পানাহার এবং সেই সাথে যাবতীয় ভোগবিলাস থেকে বিরত থাকার নাম রোজা। রোজা রেখে সকাল থেকে সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত কোনো কিছুই খাওয়া যাবে না। সন্ধ্যায় সরবত, খেজুর, ছোলা নানারকম ফল খেয়ে রোজা ভাঙা হয়। এর নাম ইফতার। আবার ঠিক ভোরের আগে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে খাবারটি খেয়ে আবার পরদিনের জন্য রোজা রাখা হয় তার নাম সেহরী।

মসজিদে ইফতারের আয়োজন হচ্ছে

তবে না খেয়ে শুধু উপোস করলে কিন্তু রোজা হবে না। রোজা রেখে কোনোরকম খারাপ কাজ করা বারণ। কারো সাথে ঝগড়া বিবাদ বা মিথ্যে কথা বলা, রাগ করা এসব কিছুই করা যাবে না। যারা

ছোটো তারা রোজা রাখতে পারে না কিন্তু বেশী বেশী ভালো কাজ এসময় করার চেষ্টা করবে। বড়দের কথা মেনে চলবে এবং নামাজ (প্রার্থনা) পড়া এবং পবিত্র কোরান (ধর্মগ্রন্থ) পড়বে।

আমাদের দেশে বহু লোক দরিদ্র। রোজা রাখলে সেসব লোকের দুঃখ কষ্টগুলো বোঝা যায়। এই রমজান মাসে দরিদ্রদের বেশী বেশী সাহায্য করতে পারলে মহান আল্লাহতালা (সৃষ্টিকর্তা) অত্যন্ত খুশি হন। একটা মজার হিসেব কিন্তু এমাসে আছে। যাদের অর্থসম্পদ আছে এবং সোনা-রুপার গয়না আছে তার ওপর একটা হিসেব ধরে সেই হিসেবের ভিত্তিতে টাকা, কাপড় ইত্যাদি এ মাসে গরীবদের মাঝে দান করতে হয় এর নাম যাকাত।

ঈদুল ফিতর

অনেক কাল আগের কথা। আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হুয়াসাল্লাম) মদীনাতে এসে দেখেন মদীনাবাসীর দুটি জাতীয় উৎসব কিন্তু এ উৎসব দুটির রীতি-নীতি, আচার-আচারণ ছিল শ্রেণী-বৈষম্য, ধনী ও দরিদ্রের মাঝে পার্থক্যের, ঐশ্বর্য-অহমিকা ও অশালীনতায় পূর্ণ। ইসলামের দৃষ্টিতে রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব সাদা কালোতে কোন ভেদাভেদ নেই। তাই মহানবী (সাঃ) তাদের ঘোষণা দিলেন আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য দিয়েছেন এ দুটো দিবস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দুটো দিবস আর সে পূণ্যময় দিবস হলো ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। সুতরাং তোমরা পূর্বের অনুষ্ঠান বর্জন করে এ দু-দিবসের অনুষ্ঠানাদি পালন কর। এভাবেই জন্ম নিল একটি প্রীতিঘন মিলন উৎসব। সাদা কালো, ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, রাজা-প্রজা, মালিক-শ্রমিক, নারী-পুরুষ সকলের ভোগ ও মহা মিলনের দিন হতে পারে এ পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিবসটি।

এবার আমরা জেনে নিই ঈদুল ফিতরের অর্থ। ফিতর অর্থ রোজা ভাঙা, খাওয়া ইত্যাদি। ঈদুল ফিতর এর রোজা শেষ হওয়ার আনন্দ। সেই আনন্দকে আমরা পালন করি ঈদুল ফিতর হিসেবে। পুরো একমাস রোজা রাখবার পর ঈদের আনন্দ তাই অপরিসীম।

আরবী শাওয়াল মাসের ১ তারিখ ঈদুল ফিতর উদযাপন করা হয়। আরবী মাস যেহেতু চান্দ্র মাস, তাই চাঁদ দেখার ওপর ঈদ কবে হবে তা নির্ভর করে। ২৯তম রমজানে সন্ধ্যার আকাশে চাঁদ দেখা গেলে পরদিন ঈদের দিন ঘোষণা করা হয়। আর সে রাতে চাঁদ দেখা না গেলে রমজান ৩০টি হয় এবং এর পরের দিন নিশ্চিতভাবেই ঈদুল ফিতর বা ঈদের দিন হয়। কেননা আরবী মাস কোনো ভাবেই ৩০ দিনের বেশি হয় না। অর্থাৎ চাঁদ দেখা গেলেই সে রাতটিকে বলে চাঁদরাত আর তার পরদিন হলো ঈদ। ঈদের চাঁদ দেখা গেলেই চারদিকে আতশ পুড়িয়ে উল্লাসে মেতে ওঠে সবাই। মেয়েরা হাতে মেহেদির নকশা আঁকে। ছোটোরা উল্লাসে বেরিয়ে পড়ে ঘর থেকে। বড়রা ঈদের বিশেষ রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

চাঁদরাত পেরিয়ে যে সকালটি এসে উপস্থিত হয় তা ঈদের সকাল। মজাদার সব খাবারের সুবাস বাতাসে ভেসে বেড়ায়। ঈদগাহতে সকালেই ঈদের নামাজটি পড়া হয়। কাজেই গোসল (স্নান) সেরে, পরিষ্কার নতুন জামাকাপড় ও টুপি পরে, আতর (সুগন্ধী) লাগিয়ে নামাজ পড়তে বেরিয়ে পড়ে ছোট বড় সবাই। নামাজ শেষে একে অন্যকে শুভেচ্ছা জানায় কোলাকুলি করে। তারপর বাড়ি ফিরে পরিবারের সকলের সাথে আনন্দে মেতে ওঠে। পরিচিত,বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন একে অন্যের বাড়ি বেড়াতে যান।

মনে রাখতে হবে ঈদ শব্দের সাথে আরো একটি শব্দ রয়েছে তাহলো ফিতর, আর ফিতর শব্দের অর্থ হলো উপবাস ভঙ্গ করা, স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা, আজকের ঈদ তাদের জন্যে যারা রমজান মাসে রোজা রেখে প্রয়াস করেছেন আত্ম সংযম করার, সৃষ্টিকর্তাকে ভয় করেছেন, ক্রোধ দমন করেছেন, অন্যের কষ্ট লাঘব করার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছেন, প্রতিবেশির ব্যথাবেদনা দূর করার চেষ্টা করেছেন, নিঃস্বের ক্ষুধা যন্ত্রণা নিজে রোজা রেখে উপলব্ধি করার, উঁচু নীচুর ভেদাভেদ ভুলে যাবার চেষ্টা করেছেন। ঈদ শুধু নিজেদের মধ্যে আনন্দ বা খুশির উৎসব নয় বরং ঈদ মানে ধনী-গরীব সকলের জন্যই বিশেষ আনন্দের দিন। শুধু নিজের জন্য নয়, শুধু ভোগে নয়, বরং সবাইকে নিয়ে আনন্দে মেতে ওঠার দিন হলো ঈদ।

মেঘ অদিতি
ঢাকা, বাংলাদেশ

ছবিঃ
উইকিপিডিয়া

মজার উৎসব হ্যালোউইন

কি খবর ইচ্ছামতীর ছোট্ট বন্ধু?

আজ তোমাকে একটা মজার উৎসবের খবর দিই। তুমি যখন কলকাতায় দুর্গাপুজো, দীপাবলীর আনন্দ করছ, তার কিছুদিন পরেই ৩১শে অক্টোবর আমেরিকায় খুদে-দের ভারি মজার উৎসব হ্যালোউইন পালন করা হয়। শুধু আমেরিকা নয়, আয়ারল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড-সহ বেশ কিছু দেশে এই উৎসবের চল আছে।তার প্রস্তুতি চলে মাসকয়েক আগে থেকে।

হ্যালোউইন এক কথায় ভূত উৎসব! ছোটরা ৩১শে অক্টোবরের রাতে নানারকম বিচিত্র ভূতের পোশাক পরে ঘরে ঘরে চড়াও হয়ে বলে, "Trick or treat?" অর্থাৎ, যদি ভালোয় ভালোয় ভূতবাবাজীকে treat হিসেবে চকোলেট, ক্যাণ্ডি ইত্যাদি উপহার হিসেবে না দেওয়া হয়, তবে তিনি রেগে গিয়ে নানারকম trick বা তুকতাক করে গৃহস্থের ক্ষতি করবেন। গোটা ব্যাপারটাই অবশ্য স্রেফ ছোটদের মজা।

এই হ্যালোউইন বেশ প্রাচীন প্রথা। ষোড়শ শতাব্দীতে শেক্সপীয়ারের এক নাটকেও এর উল্লেখ আছে। প্রথমদিকে নাকি ভিক্ষুকেরা এই দিনটিতে ঘরে ঘরে গিয়ে পরিবারের মৃত ব্যক্তিদের আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করত, আর বিনিময়ে পেত খাবার বা কিছু উপহার।

এই উৎসবকে এখন রীতিমত বাণিজ্যের মোড়কে ঢেকে ফেলা হয়েছে। আগষ্ট মাস থেকেই দোকানে দোকানে এসে যায় বিচিত্র সব হ্যালোউইন কস্টিউম, প্রায় আমাদের পুজোর বাজারের মত। ভূত পেত্নী, ডাইনীবুড়ি, কঙ্কাল ছাড়াও যোগ হয়েছে নানান কার্টুন চরিত্রের পোশাক।সেই গুপী-বাঘার গানের মতই রোগা-ভূত, মোটা-ভূত, বেঁটে-ভূত, ঢ্যাঙা-ভূত সবারই রংবাহারী মুখোশের মেলা। ছোটদের উৎসাহ দেখার মত।

হ্যালোউইনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে Pumpkin Carving বা বিরাট বিরাট কুমড়োকে কায়দা করে কেটে তার গায়ে ভূতের চোখ-মুখ আঁকা।ভেতরটা থাকবে ফাঁকা। সেখানে মোমবাতি জ্বেলে ঘরের বাইরে রাত্রে বসাতে হবে।দূর থেকেও দেখা যাবে অন্ধকারে জ্বলছে ভূতের চোখ! সমস্ত সুপার মার্কেট আর আনাজপাতির দোকানে মাসখানেক আগে থেকেই থরে থরে সাজানো হয় বিশেষ ধরনের কুমড়ো।

দোকানে সাজানো কুমড়ো

এগুলো ফলানোই হয় হ্যালোউইনের জন্য।এই জাতের কুমড়ো লোকে খায় না। কী বিচিত্র তাদের আকার! হাতের তালুতে বসানো যাবে এমন মিনিয়েচার থেকে বারোশ পাউণ্ডের দৈত্যাকার কুমড়ো -

সবই মিলবে এ বাজারে!

দৈত্যাকার কুমড়ো

ক্ষুদে কুমড়ো

আমেরিকা প্রবাসের প্রথম বছরে সস্ত্রীক অংশ নিয়েছিলাম এই রকম এক কুমড়ো-শিল্পের ওয়ার্কশপে। সৌজন্যে - আমাদের ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যুক্ত একটি চার্চ।তারা বিভিন্ন দেশ থেকে আসা ছাত্রছাত্রী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য সারা বছর ধরেই সামাজিক মেলামেশা ও সাংস্কৃতিক আদান-

প্রদানমূলক অনুষ্ঠান করে থাকে।হ্যালোউইন উপলক্ষেও এমন এক কর্মসূচী নিয়েছিল তারা। গিয়ে দেখি প্রচুর ছোটরা আর তাদের মা-বাবাদের ভিড়।

কুমড়ো খোদাই করছে ছোটরা

অধিকাংশই চীন আর কোরিয়ার বাসিন্দা। দস্তুরমত বিশেষ বিশেষ যন্ত্রপাতিও আছে Pumkin Carving-এর জন্য। প্রথমে বেশ হৃষ্টপুষ্ট একটা কুমড়ো বাছাইএর পর হাতে এল ক্ষুদে করাত। তা দিয়ে কুমড়োর বোঁটার কাছ থেকে বেশ খানিকটা গোল করে কেটে হাত ঢোকানোর জায়গা করা হল।আরো কিছু অস্ত্রশস্ত্র ছিল - ভেতর থেকে শাঁস বের করা আর শেষ অবধি কুমড়োর গায়ে খোদাই করে ভূতের নাক-মুখ-চোখ আঁকার জন্য।

ঘন্টাদুয়েক ধরে গলদঘর্ম হয়ে ভূতের চক্ষুদান-পর্ব মিটলো। নানা দেশের একগাদা আনাড়ী লোকজন মিলে এই ওয়ার্কশপের হুড়োহুড়িতে বেশ মজা হয়েছিল।অবশ্য ঐ কেজি-পাঁচেক বস্তুটিকে হাতে করে ঘর অবধি আনার অভিজ্ঞতাটা বিশেষ সুখকর হয় নি।

খোদাই শেষ হওয়ার পরে

কুমড়ো-ভূত ছাড়াও হ্যালোউইনের অন্যান্য আকর্ষণ হল scare crow বা আমাদের পরিচিত কাকতাড়ুয়া। খড় দিয়ে মানুষের সাইজের পুতুল বানিয়ে তাকে রীতিমত বাহারী জামা, ডেনিম, টুপি পরিয়ে সাজানো হয়। আর ঝাঁটায় চড়া ডাইনি বুড়িরও ভালোই জনপ্রিয়তা!

কাকতাড়ুয়া

ডাইনি-বুড়ি

তোমার জন্য এই মজার উৎসবের প্রস্তুতিপর্বের কিছু ছবি পাঠালাম দুর্গাপুজোর সাথে সাথে ভিনদেশের

আরেক মজাদার উৎসবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে।

লেখা ও ছবিঃ
জ্যোতির্ময় দালাল
টেক্সাস, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

চেনা দেশ - অচেনা উৎসব : থ্যাঙ্কস্-গিভিং

আমরা এখন আমেরিকার টেক্সাসে কলেজ স্টেশন নামে একটা ছোট্ট শহরে থাকি। দু-বছর আগে গরমের সময় এখানে এসে পৌঁছাই। প্রথম কিছু মাস ভালোই কাটল। কিন্তু পুজোর সময়টা কাটাতে বেশ কষ্ট হয়েছিল। সেই সময় আমেরিকার কিছু উৎসবের ব্যাপারে জানা গেল যেগুলো আমাদের কাছে একেবারে নতুন।

এখানে ২১শে নভেম্বর থ্যাঙ্কস্-গিভিং নামে একটা উৎসব হয়। প্রত্যেক ঘরে ঘরে আর গীর্জায় এই উৎসব পালন করা হয়।

আমাদের বাড়ির আশেপাশে বেশ কয়েকটা গীর্জা আছে। এমনই এক গীর্জার নেমন্তন্নে গিয়ে দেখি অনেক লোকের ভিড় - সবাই আমাদের মত থ্যাঙ্কস্-গিভিং-এর ডিনারে এসেছে।

প্রথম থ্যাঙ্কসগিভিং

ডিনারের আগে ছোট একটা নাটিকা অভিনীত হল যার মাধ্যমে আমরা এই উৎসবের ইতিকথা জানতে পারলাম। এই উৎসবের মূল ভাবনা হল আমাদের সকলকে আহারের সংস্থান করে দেবার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো। এই উৎসবের সূচনা হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। English Separatist Church - এর ১০২ জন সদস্য ধর্মীয় গোঁড়ামি আর কঠোরতা থেকে মুক্ত এক স্বাধীন পৃথিবীর স্বপ্ন চোখে আমেরিকা পাড়ি দেন। তাঁরা প্রথমে কিছুদিন হল্যাণ্ডে কাটান, তারপর ফের পাড়ি জমান আটলান্টিকের অপর পারের উদ্দেশ্যে। কিন্তু ১৬২০ সালে প্লাইমাউথ পৌঁছে তাঁদের অত্যন্ত প্রতিকূল আবহাওয়ার সম্মুখীন হতে হয়। এক বছরের মধ্যেই প্রাণ হারান ৪৬ জন। তারপর স্থানীয় আদি বাসিন্দারা, যাদের আমরা রেড ইণ্ডিয়ান নামে চিনি, তাদের সাহায্য নিয়ে এঁরা চাষবাস শুরু করেন। পরের বছর ভাগ্য তাঁদের সহায়

হয়। প্রচুর ফসল ফলে - সকলের প্রাণধারণের ব্যবস্থাও সুগম হয়। তখন সেই জীবিত সদস্যরা তাদের নতুন রেড ইণ্ডিয়ান বন্ধুদের আর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য শুরু করেন থ্যাঙ্কস্-গিভিং উৎসব।

চার্চের অনুষ্ঠান

এবারে জানা যাক ডিনারের মেনুটা কেমন হয়! প্রধান হল টার্কির রোস্ট।আর আছে ম্যাশড় পটেটো বা আমাদের চেনা আলুভাতে!! আছে কুমড়ো দিয়ে তৈরী মিষ্টি - পাম্পকিন পাই,ক্র্যানবেরি স্যস্ আর বিভিন্ন রকমের মরশুমী শাকসব্জী।

টার্কির রোস্ট

পাম্পকিন পাই

সবাই মিলে খাওয়াদাওয়া

কলকাতার দুর্গাপুজো মিস করার দু:খ কিছুটা হলেও কম করেছে এই অচেনা উৎসব।

আমাদের দৈনিক ব্যস্ত জীবনে আমরা কোথাও যেন ঈশ্বরকে ভুলে যেতে চলেছি। তাই থ্যাঙ্কস্-গিভিং-এর মাধ্যমে ঈশ্বরকে জানাই আমাদের কোটি কোটি ধন্যবাদ!

লেখা ও ফটোগ্রাফঃ
রূপসী দালাল
টেক্সাস, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

মজার পাতা

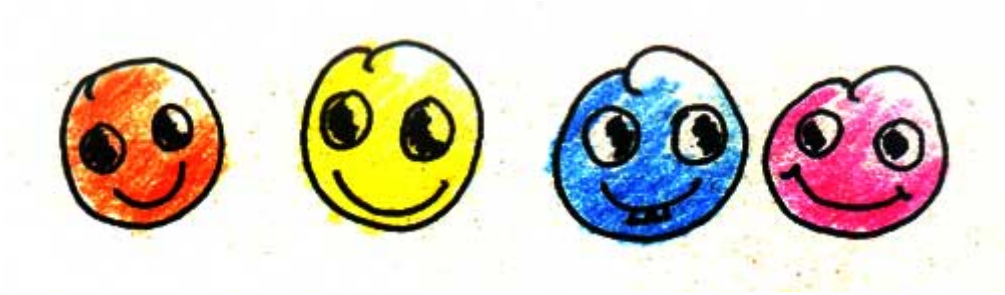

বলো তো দেখি কী—

১. বকা ঝকা হবে সারা, পেট কাটা গেলে,
শুধুই হবে তো বলা, শেষ চলে গেলে।।

২. প্রথমার্দ্ধে রাজনের, আছে দেহ পদহীন
আদি অন্তে তবু রাগ, চারে মিষ্টান্ন মহান।।

৩. তিন অক্ষরে সুমিষ্টান্ন, শেষে গুপ্ত দেশ,
সন্দেহের শেষ নেই, আগেতে বিশেষ।।

৪. সম্পদদায়িনী তিনে, মধ্যহীনে ফল,
অন্তহীনে হয় কম, নাম দেখি বল।।

৫. সাধ যখন ওঠে জেগে, মতীর মনেতে,
চারিবর্ণে সুবিখ্যাত, চেনে জনে জনে।

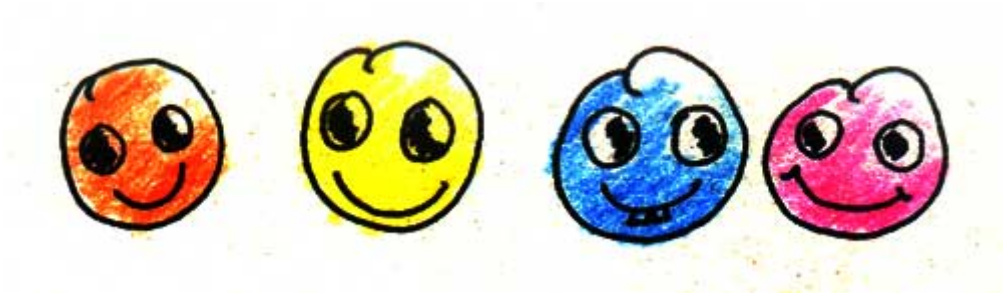

উত্তরমালাঃ

১. বলাকা
২. রাজভোগ
৩. সন্দেশ
৪. কমলা
৫. ইচ্ছামতী

অধ্যাপক (ডঃ) জি.সি. ভট্টাচার্য্য,
বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়,
বারাণসী, উত্তর প্রদেশ।

ছড়া-কবিতা

কচি-কাঁচার প্রতি

তোমরা হাসো দেখেই প্রাণে এক চিলতে হাসি।
তোমরা আছো, তাই তো আজও বাঁচতে ভালোবাসি।
তোমরা কাঁদো বলেই তবু হঠাৎ জেগে উঠি –
গোলকধাঁধার জাল সরিয়ে সূর্য ছুঁতে ছুটি।

নতুন মুকুল, খুশির খবর ছড়িয়ে কলরোলে
বাড়িয়ে মুঠি দাঁড়াও উঠে বিশ্বমায়ের কোলে।
পড়ুক চোখে এই পৃথিবীর বিচিত্র বর্ণালী –
সুনীল সাগর, সবুজ মাটি, দিগন্ত স্বর্ণালী।
বইতে থাকুক স্নিগ্ধ বাতাস, দরজা-জানলা হাট।
দৌড়ে চলার পথ ছুঁয়ে যাক তেপান্তরের মাঠ।

ঘুচিয়ে কালো অন্তরে দাও নতুন দিনের স্বাদ –
ভোরের কলি, এই আমাদের ছোট্ট আশীর্বাদ।

অনিরুদ্ধ সেন
থানে, মহারাষ্ট্র

পক্ষীরাজ

উড়ে উড়ে চললি কোথায়
ওরে আমার পক্ষীরাজ?
বেশ তো ছিলি ঘরের মাঝে
নীল আকাশে তোর কি কাজ?
বেশ তো ছিলি খেলনা হয়ে
পুতুলগুলোর সাথে,
যখন খুশি তখন তোকে
নিতাম তুলে হাতে
গায়ে দিতাম নীল কাপড়ে
চুমকি জরির রঙ্গীন কাজ;
পুতুলগুলো কাঁদছে ভীষণ
আয় না ফিরে পক্ষীরাজ
মেঘের ঢেউ এ খেলা করে
বিকেল হলেই আসবি ফিরে
পুতুল গুলোর বিয়ে দেব
আনন্দে তুই করবি নাচ।

দ্বৈতা গোস্বামী
ব্যাঙ্গালোর, কর্ণাটক

মিষ্টি মেয়ে দুষ্টু মেয়ে

ঐ মেয়েটা মিষ্টি মেয়ে
দুষ্টু মেয়েও বটে
কখন চোখে বিষ্টি নামে
কখনো রোদ ঠোঁটে।
ঐ যে দ্যাখো আপন মনে
করছে বসে খেলা
পড়তে বসেও এতটুকু
নেই যে অবহেলা ;
কখনো বা অঙ্ক কষে
কখনো বা ছবি
এখন বসে আঁকছে দ্যাখো
ডুবন্ত এক রবি।
ভাইয়ের সাথে ঝক্কি যত
শতেক অভিযোগ
সব ভালো তার এটাই শুধু
একমাত্র রোগ।

জামাল ভড়
বারাসাত, উত্তর চব্বিশ পরগনা

শারদ শুভেচ্ছা

হিমেল হাওয়ার আলতো ছোঁয়ায় দুললো কাশের বন
সকালবেলায় শিউলিফুলের গন্ধে উতল মন।
সূর্যিমামা ছোট্ট উঁকি দিলেন মেঘের ফাঁকে
ঢ্যামকুড়াকুড় বাজায় ঢাকি, কেউ কি ঘরে থাকে?
মা দুগগা আসছে - সবাই মাতলো মনের সুখে
আনন্দেরই ঝিলিক জাগে শিশিরকণার বুকে।
ইস্কুলেতে পড়লো ছুটি, বই - খাতা - পেন - ঝোলা
চারটি দিনের জন্যে সবই থাকবে শিকেয় তোলা।
থাকুক সবাই এই কটা দিন দু:খ - বিষাদ ভুলে
জানাই শারদ শুভেচ্ছা মোর ইচ্ছামতীর কূলে।।

জ্যোতির্ময় দালাল
টেক্সাস, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

পরিবেশ

মা,শুনেছ বাবার কান্ডখানা
আমাদেরআম-কাঠালেরবাগান ভেঙে
তুলবে নাকি মস্ত বাড়ি।
বাবা বিচ্ছিরি, তাই যদি হয়
বাবার সাথে জন্ম –আড়ি।

আমের গাছে বোল হবে না
মিষ্টি গন্ধ বইবে নাকো আর
ঘুঘু, টিয়া, ময়না, কোকিল
অনেক দূরে যাবে চলে
কে আমার ঘুম ভাঙাবে
রোজ সকালে,মা আমার?

মা, সত্যি করে বলো
আমরা সবাই যাব চলে
বাগান, এ বাড়ি, থাকবে না আর
বলো,' ছোটকা মিথ্যে বলে'।

তোমার চোখে জল কেন মা
দাঁড়িয়ে কেন চুপটি করে?
আমি দেখ কাঁদছি না আর
তবু মনটা যে কান্না করে।

সমর চট্টোপাধ্যায়
গড়িয়া গার্ডেন্স, কলকাতা

মেঘ সূর্য্যের খেলা

মেঘলা দুপুর একলা টুপুর মেঘের সাথে খেলে
মেঘ হেরে যায় তখন যখন সূর্য্য আলো জ্বালে।
রোদমাখা মেঘ বৃষ্টি ঝরায় দূরের পাড়ার ছাদে-
তখন বুঝি হারার ভয়ে কালচে মেঘও কাঁদে।
কখনও বুঝি রাগ করে সে গাছের মাথায় ফোঁসে,
কখনও আবার অঝোর ধারে ছুট্টে নেমে আস,
নাচতে থাকে চিলের ছাদে, ঝাপসিয়ে নিমঝাড়,
ঝরঝরিয়ে সাজায় ফোঁটায় গাছের ডাল আর তার।
যখন হঠাৎ থমকে থামে হাসে ভিজে রোদ
ছিঁড়ে খুঁড়ে মেঘের গাউন তুলতে থাকে শোধ।
মেঘে রোদে মিলেমিশে আকাশ জুড়ে আঁকে
রামধনু রং ছিটে ফোঁটা কিংবা লম্বা বাঁকে।
সিঁদুর রঙা চেহারা হলে তবেই খেলা শেষ
দিন জাগাতে সূর্য্য ছোটে সাগরপাড়ের দেশ -
সেই দেশে এক অন্য টুপুর মেঘের সাথে খেলে,
সূর্য্য গিয়ে তাদের সাথে সেই খেলাতে মেলে।

সংহিতা
সল্ট লেক, কলকাতা

পুজোর ছুটি

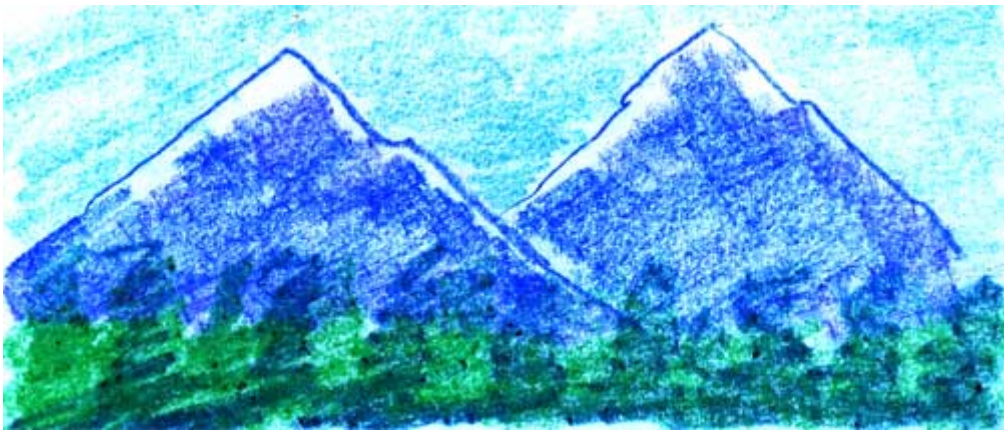

বাবা বললেন ঝিনুক পুজোতে
এবার কোথাও যেতে চাও তুমি?
ঝিনুক বলল ভালই লাগবে
যদি নিয়ে যাও খর মরুভূমি.

ঝিলিক বলল আমি ভালবাসি
বালিয়াড়ি আর সাগরের ঢেউ
খুব মজা হবে পুরি বা দীঘায়
আমাদের যদি নিয়ে যায় কেউ.

আমার পসন্দ বলল চিকাই
পাহাড় এবং মেঘের মিছিল
তাই যেতে চাই এবার পুজোয়
মুসৌরি নয় টাইগার হিল.

বাবাই বলল ভালই লাগেনা
দীঘা, মরুভূমি, শৈল শহর
তাইতো পুজোয় হলদিয়া যাব
যেখানে দাদু ও দিদুদের ঘর.

তন্ময় দাশ
ভদোদরা, গুজরাট

রঙে রঙে রঙীন

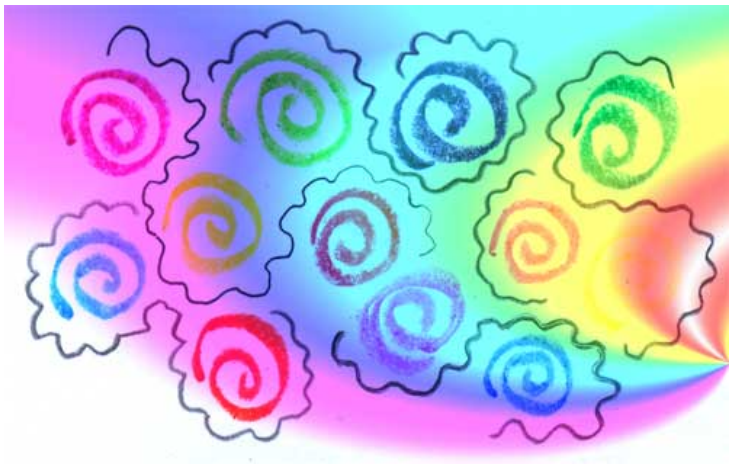

কেমন করে লাগলো ও রঙ পরীর ডানার প্রান্তে-
তাতাই গেল ঘোড়ায় চড়ে সেই কথাটাই জানতে।
ঘোড়া তো নয়, সে পক্ষীরাজ, নীল আকাশে ছুটলো
রামধনুরঙ সাতটি ঘোড়ার বন্ধু এসে জুটলো।
মিহিসুরের চিঁহি ডাকে বললে তারা, তাই কি,
সত্যি বলো, সে রঙ তোমার সত্যি করেই চাই কি?
ছুঁয়ে দেখো, সে রঙ আছে তোমার চোখের মধ্যে
স্বপ্নে লেখা ঘুমেল আলোর রুলটানা এক পদ্যে।
শুনেই তাতাই সে রঙ ছুঁতে চোখদুটো যেই মেললো,
সুয্যিমামা ভোরের হাসি অমনি হেসে ফেললো।

আবার রাতে তাতাই যখন ঘুমে দু'চোখ বুজলো
তারার দেশের হরেক পরী সে রঙ এসে খুঁজলো।
লাগিয়ে নিলো সে রঙ তারা তাদের ডানার প্রান্তে,
সাতটি ঘোড়াও নিলো সে রঙ সূর্যের রথ টানতে।
ফুল আর পাখি বললো, আরো গহীন স্বপন আঁকতে
ভোরের আলোয় ও রঙ মেখে ওরাই যাবে ডাকতে।
শিশিরকণা, রামধনু আর মেঘ বললে, তাই তো,
নতুন সাজে সাজতে আমার ও রঙটুকুই চাই তো।
তাতাই বলে, এসব শেষে রঙ যদি হয় শেষ!
সুয্যিমামা উঠলো হেসে- থাকবে যে তার রেশ।।

তন্ময় ধর
নতুন দিল্লী

সাত ছড়া

(১)
হেলিকপ্টার দেখে ফড়িং বলে,
আমারই জাত ভাই!
চেহারায় হোক ছোট বড়,
তফাৎ বিশেষ নাই.

(২)
ফুলকে ডেকে প্রজাপতি কয়--
জানিস,আমি কে?
আকাশপরীর জাত আমি ভাই,
শুধাস মাম্মিকে.

(৩)
ব্যাং বলে তার ঠ্যাঙ তুলে ওই,
আমায় ভুললে নাকি?
গানের ব্যাপরে তানসেন জেনো,
রাগ ধরে আমি থাকি .

(৪)
টিকটিকি বলে ঠিক ঠিক কথা,
কুমির আমার ভাই,
ছোট্ট আমি,তবু কেন ভয়,
--আমার জানা নাই!

(৫)
বিড়াল বলে সবাই তো জানে,
আমি বাঘের মাসি!
বাঘকে আমি করি নাকো ভয়,
গোঁফে ফাঁকে হাসি.

(৬)
নেংটি ইঁদুর,ধেড়ে ইঁদুর,
সব নাকি ভাই ভাই!
বেড়াল বলে,খাবো খপাখপ--
ছোট বড় ভেদ নাই!

(৭)
কেঁচো বলে,সাপ হবো আমি
আমি তো সাপেরই জাত,
বিষ মুখে পেলে,প্রমাণ দেখাবো,
দংশাবো নির্ঘাৎ!

তাপসকিরণ রায়
জবলপুর, মধ্যপ্রদেশ

গল্প-স্বল্প

পটলবাবুর বিজ্ঞানচর্চা

কলকাতার রাস্তায়, খুড়ি আকাশে, পুরোদমে উড়ুক্কু ট্যাক্সি চালু হওয়ার পরেই নামল এক মহা বিপদ। এমন একটা বিপদ যা কেউ কল্পনাও করতে পারেন নি।

প্রথমে যখন সেগুলোকে পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হচ্ছিল, তখন সবাই অবাক। পথচলতি মানুষ হাঁ করে তাকিয়ে দেখত বৈজ্ঞানিকদের কান্ডকারখানা। গল্পে আড্ডায়, তর্কে বিতর্কে সবার মুখে এই একই কথা। সবাই বলতে লাগল এতদিন পরে ভগবান মুখ তুলে চাইলেন, এই প্রথম কলকাতায় একটা জিনিস চালু হতে চলেছে যা তাক লাগিয়ে দেবে দুনিয়াকে। সাহেবরা যা তৈরী করতে পারল না, তা করে ফেলল বাঙালী। কয়েকদিন এরকম চলার পর অবশেষে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়ালো নতুন ট্যাক্সি। তাতে

থাকবে একটা করে নতুন গিয়ার যা রাস্তা থেকে সোজা ওপরে উঠিয়ে নিয়ে যাবে গাড়ি।

লাইন পড়তে শুরু করল। এবার আর ট্রাফিক জ্যামে দাঁড়াতে হবে না, কষ্ট করতে হবে না। কেউ কেউ বলতে লাগল, ওপরটা তো একটু ঠাণ্ডাও। গরমে ঘামতে হবে না, ধুলো মাখতে হবে না। আরো কত কি। কিন্তু আদপে হল উল্টোটা। যে সমস্যাটার কথা কেউই ভাবেন নি।

বিজ্ঞানীরা গাড়িকে ওড়ানোর ব্যবস্থা করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু রাস্তার কথাটা তো আর মাথায় রাখেন নি। আর রাখবেনই বা কেন? আকাশে কোন জিনিস উড়তে গেলে রাস্তার দরকারটাই বা কি। যেমন খুশি উড়ে গেলেই হল। আর সেইখানটাতেই বাধল গোলমাল। হু হু করে উড়ে যাওয়া ট্যাক্সির মধ্যে ধাক্কা লাগতে শুরু করল। ড্রাইভারদেরও কোন দোষ দেওয়া যায় না। তারা তো আর পাইলট নয়, তারা আজীবন গাড়ি চালিয়েছে ধুলোমাখা রাস্তায়। আর প্লেনের মত অগুনতি ট্যাক্সিকে রাডার দিয়ে কোনও নির্দিষ্ট পথে চালানোও সম্ভব নয় –আর সে কথা কেউ আগে ভাবেনও নি। বিজ্ঞানীরা আশ্বাস দিয়েছিলেন, ট্যাক্সির উড়ান সফল হওয়ার পরে ধীরে ধীরে চালু হবে উড়ুক্কু বাস। ধাক্কাধাক্কির বহর দেখে তাঁরা আর এই নিয়ে উচ্চবাচ্য করলেন না। সকলেই বলাবলি শুরু করল যে এবার এই ট্যাক্সি বন্ধ না হয়ে যায়।

এদিকে উড়ুক্কু গাড়ির জন্য তো আর সিগন্যালও নেই। মাটিতে চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়ানো ট্রাফিক পুলিস যে তা উড়তি গাড়ি সামলাবেন সে গুড়ে বালি। এমনিতেই রাস্তা সামলাতেই হিমশিম। তার ওপরে আবার আকাশে নজর রাখবে কে? ফলে ধাক্কা লাগা যে কমিয়ে আনা যাবে তাও সম্ভব হল না। বিজ্ঞান কাউন্সিলে একজন পরামর্শ দিয়েছিলেন যে আকাশ থেকে যখন ট্রাফিক সিগনাল দেখা যাচ্ছে না বা মানা যাচ্ছে না, তখন না হয় উড়ুক্কু ট্রাফিক পুলিস বহাল করা হোক। বলাই বাহুল্য, ধাক্কার বহর দেখে কেউ সে দায়িত্ত নিতে রাজি হননি।

শেষটায় অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে উড়ুক্কু ট্যাক্সির মালিকরা নিজেরাই নেমে এলেন মাটিতে। কেউ আর রাজি হলেন না গাড়ি নিয়ে ওপরে উঠতে।

ক্যান্টিনে, রাস্তার মোড়ে, পান দোকানে আবার একরাশ জল্পনা কল্পনা শুরু হয়ে গেল – এবার বৈজ্ঞানিকরা কি করবেন? বাঙালীর গর্বের উড়ুক্কু ট্যাক্সি কি বন্ধ হয়ে গেল? এদিকে পূজো এগিয়ে আসছে। সেজন্য বিশেষ নোটিস জারি হল, যাদের উড়ুক্কু ট্যাক্সি আছে, তারা চাইলেও অক্টোবরের কটা দিন উড়তে পারবেন না।

অনেকে ভেবেছিলেন আকাশ থেকে রঙচঙে প্যান্ডেল গুলো দেখবে। তারা কেবলই হা হুতাশ করতে থাকলেন।

রিটায়ার করার পর সকলেই কিছু না কিছু করে। পটলবাবু ঠিক করলেন যে তিনি বিজ্ঞানী হবেন। ছাত্রজীবনে বিজ্ঞানসাধনা করতে চেয়েছিলেন। তখন কেউ পাত্তা দেয়নি। সকলেই চিরকাল তাঁকে অবজ্ঞা করে এসেছে, তাই এইবেলা একটা জবাব না দিলেই নয়। ঠিক করলেন রীতিমত গবেষণাগার গড়ে আবিষ্কার টাবিষ্কার করে সব্বাইকে তাক লাগিয়ে দেবেন।

পটলবাবু যে এরকম মতলব ফাঁদছেন, এই ব্যাপারটাই কেউ আঁচ করে উঠতে পারেনি। ছেলেমেয়েরা তো নয়ই, নিদেনপক্ষে বউও না। এমনকি অফিসের বা পাড়ার বন্ধু বান্ধবরাও না। করবে কি করে? কেউ তাঁকে কোনদিন সায়েন্স ম্যাগাজিন পড়তে, খবরের কাগজে বিজ্ঞানের পাতা নিয়ে নড়াচড়া করতে

বা নিদেনপক্ষে টিভির চ্যানেল ঘোরাতে ঘোরাতে ডিসকভারি কিংবা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকে এসে থমকে যেতে দেখেনি। সবাই জানে পটলবাবু আর পাঁচটা সুখী, গৃহস্থ লোকের মতই। তাঁর মধ্যে যে সাংঘাতিক বিজ্ঞানস্পৃহা লুকিয়ে আছে তা বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই।

তো এই পটলবাবু রিটায়ার করলেন। পরদিন সকালে বাল্যকালের বন্ধু গোবিন্দবাবু এসে বললেন, "ওরে, এবার ঘরে বসে কি করবি? কাল থেকে চল মর্নিং ওয়াক করি।" পটলবাবু খুব একটা উচ্চবাচ্য করলেন না।

"কেন রে? মর্নিং ওয়াকটা খারাপ কিসে? ও বুঝেছি। সকালবেলায় ঘুম থেকে ওঠার ভয়? ওতে কোন অসুবিধে নেই, আমি ফোন করে ডেকে দেবোখন।"

পটলবাবু একটু গলা পরিষ্কার করে বললেন - "না মানে ঠিক তা নয়। ভয় পাবো কেন? আসলে এই তো সবে রিটায়ার করলাম। তাড়াহুড়োর কি আছে? কয়েকটা দিন যাক, না হয়-"

"না না, তাড়াহুড়োর দরকার নেই মানে? আমি বলছি অবশ্যই আছে। একশো বার আছে। একবার বাড়িতে বসে আরামের জীবনে অভ্যেস হয়ে গেলে তোর কি অবস্থা দাঁড়াবে ভাবতে পেরেছিস? আমার মতে তোর একটা দিনও দেরী করা চলবে না"

পটলবাবু কিছু বললেন না। চুপ করেই রইলেন। ভাবলেন গোবিন্দ চিরকালই হম্বিতম্বি করে সব ব্যাপারে। ও রিটায়ার করেছে দুমাস আগে। এতদিনে সব ঠিক ঠাক করে ফেলেছে। গোবিন্দবাবু বলে চললেন, "আর হ্যাঁ, শুধু হাঁটতে গেলেই চলবে না। লাফিং ক্লাবে যেতে হবে, ব্যাডমিন্টন খেলতে যেতে হবে। তারপরে লাইব্রেরীর মিটিং এ যেতে হবে।

পটলবাবু মাথা নেড়ে হুঁ বললেন বটে, কিন্তু ভেতর ভেতর তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন যে এই খপ্পরে পড়লে তাঁর বিজ্ঞানসাধনার ভরাডুবি হবে। সারাদিন হাঁটাহাঁটি, খেলাধুলো, আড্ডা এইসব করলে আর কোন সময় পাওয়া যাবে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার জন্য? নাঃ, ভূতোর কথায় সায় দিলে একদমই চলবে না। গোবিন্দবাবু দুটো শিঙ্গাড়া আর চা সাবাড় করে হাত ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে পড়লেন আর বলে গেলেন থ্রি কোয়ার্টারস সাদা প্যান্ট আর গেঞ্জি যোগাড় করে রাখতে। পটলবাবু ভুরু কুঁচকে খানিক ভাবলেন। তারপর বউকে ডেকে বললেন - "হ্যাঁ গো, তুমি বলছিলে না অনেকদিন নাতিকে দেখা হয় না। তা যাও না কয়েকটা দিন বেড়িয়ে এস? আমি টিকিট কেটে দিচ্ছি।"

দুটো দিন কেটে গেছে।

বেশ খুশী খুশী মনে চিলেকোঠার ঘরটায় এলেন পটলবাবু। পা মচকে গেছে বলে গোবিন্দকেও কয়েকদিনের জন্য ঠেকিয়ে রাখা গেছে। গিন্নীকেও রওনা করে দিয়েছেন দিল্লীর পথে। রিটার্ন টিকিট কেটে দেওয়া নেই। কাজেই এখন কয়েক দিনের জন্য নিশ্চিন্ত। নাতিকে পেয়ে প্রতিমা কয়েকটা দিন সুখেই কাটাবেন নিশ্চয়ই। যখন তাঁর ছেলে শ্যামল দিল্লীতে চাকরিটা পেয়ে গেল,তখন একদিক থেকে স্বার্থপরের মত একটু খুশিই হয়েছিলেন পটলবাবু। তারপরে মেয়ে নীলার বিয়েও হয়েছে পুনেতে। এখন বাড়ি ফাঁকা পেয়ে বেশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। চিলেকোঠার ঘরটায় কেউ বড় একটা আসেনা। আসবেই বা কেন? এখানে তো তেমন কিছু নেই। থাকার মধ্যে পুরনো কাঠের একটা আলমারি, একটা চৌকি, একটা ইজিচেয়ার আর পুরনো কাগজ, ম্যাগাজিন এইসব। এই ঘরটাই গবেষনাগার তৈরী করার পক্ষে আদর্শ।

পুরনো কাগজের মধ্যে চাপা পড়ে থাকা একটা খাতা বের করে আনলেন তিনি। ছাত্রজীবনে যা নোটস ছিল তা অনেকদিনই হারিয়েছে। তবে সম্প্রতি নতুন করে প্ল্যান করা শুরু করেছিলেন তিনি। ল্যাব তৈরী করতে খরচ খরচা লাগবে আন্দাজ করে আগে থেকে কিছু টাকাপয়সাও জমা করে রেখেছিলেন। ইজিচেয়ারে বসে নোটসগুলো একটু ঝালিয়ে নিতে শুরু করলেন পটলবাবু। অনেক কিছু লাগবে এখানে। একটা পাথর বসিয়ে তার ওপরে বুনসেন বার্নার, টেস্ট টিউব, বকযন্ত্র, চারকোল এইসব তো লাগবেই। অন্যদিকে থাকবে একটা ব্ল্যাকবোর্ড। আরেক পাশে ড্রয়িং এর ব্যবস্থা। ইলেকট্রনিক্সের ছোটখাট সার্কিট বোর্ড, আইসি, রেসিস্টেন্স, ট্রান্সিটর, এলইডি আরও কত কি। যেমন ভাবা তেমন কাজ শুরু হয়ে গেল। ল্যাবরেটরি হই হই করে গজিয়ে উঠল।

প্রথমে কি নিয়ে কাজ শুরু করবেন একটা ঠিক করতে একটু অসুবিধেয় পড়লেন। একবার ভাবলেন একটা রোবটের প্রোটোটাইপ বানাবেন অর্থাৎ ছোটোখাট একটা মডেল রোবট। তবে রোবট তৈরী তো আর সহজ কথা নয়। যেমন মেকানিক্স বুঝতে হবে, তেমনি ইলেকট্রনিক্স।

ল্যাবরেটরিতে ঢুকলে যে বাবু আর বাবু থাকেন না সেটা প্রথম বুঝতে পারল বাড়ির চাকর খেঁদু। নাওয়া খাওয়ার ঠিক নেই। কারো সাথে কথা বলেন না। দেখা করেন না। রাতেও অনেকক্ষন ধরে কাজ করতে থাকেন। শব্দ পাওয়া যায়। তাও আবার এক এক সময় এক এক রকম। কখনও আস্তে, কখনও জোরে। কখনও লোহা ঘষার, কখনো করাতের। আবার কখনো বা হাতুড়ি পেটার। তিনতলার ঘরে আবার একটা চিমনি হয়েছে। তাতে এক এক সময় এক এক রঙের সব ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। গিন্নীমা নেই। আর খেঁদুর এত সাহস নেই যে সে বাবুকে গিয়ে কিছু বলে। সে কাজে নতুন বহাল হয়েছে। আগের লোকটিকে কেন ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সেই নিয়ে তার ঠিক ধারনা নেই। আর গ্রামের বাইরে এই প্রথম সে এসেছে। শহরের গতিক ঠিক এখনও বুঝে উঠতে পারেনি। এদিকে বাবুর শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে। দাড়ি টাড়ি কামান তো উঠেই গেছে।

ওদিকে বাবুর এক বন্ধু এসে দিনে দুবার করে খোঁজ নিয়ে যাচ্ছে। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা। তার ওপরে বুড়ো বয়সে শরীরের গঠন এক্কেবারে মজবুত। কথা শুনলে হাত পা গুলো যেন সেঁধিয়ে যায় পেটের ভেতরে। বাবু বলে রেখেছেন, যে কেউ এলেই যেন বলা হয় পুনেতে মেয়ের কাছে গেছেন। আর সকলকে তো না হয় সেই কথা শোনান যাচ্ছে, কিন্তু এই একটা লোকের সামনে মিথ্যে বলতেই যেন থরথর করে কেঁপে ওঠে খেঁদু। আর যেখানেই বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যে হয়। বেলা এগারোটা নাগাদ গোবিন্দবাবু এসে হাজির।

“এই ছোকরা। তোর বাবু কোথায়?”
“আজ্ঞে, আপনাকে যে বললুম গতকাল। উনি তো সেই পুনা না কোথায় গেচেন, অনেক দূর শুনেছি। এর মধ্যেই কি আর ফিরবেন?”
“বটে, তা তোর বাবু কোন খবর দিয়ে যায় নি কবে ফিরবে?”
“আজ্ঞে না বাবু। কিছু তো বলেন নি। ”
“ বটে!”

খানিক পায়চারি করে বসার ঘরের সোফায় ধুপ করে বসে পড়লেন গোবিন্দবাবু। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ রে, বাবু ক চামচ চিনি খেয়েছেন আজ সকালে?'
“এজ্ঞে, দু চামচ।”
গোবিন্দবাবু এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে বাঘের মত চোখ বড় বড় করে বললেন, “তবে রে ব্যাটা। এতক্ষন আমার সঙ্গে চালাকি করছিলিস?”
“এজ্ঞে না বাবু”, খেঁদু তখনও বুঝে উঠতে পারেনি সে কি গোলমালটা করেছে।
গোবিন্দবাবু লাফিয়ে এসে একরকম জামার কলারটাই চেপে ধরলেন, “তবে রে। বুঝতে পারিস নি? তোর বাবু নাকি পুনে গেছে? তো সকালবেলায় কি ভূতের পিঠে চড়ে এসেছিল চা খেতে? আমি তখনই বুঝেছি একটা গড়বড় আছে। এখনও সময় আছে। ভালো চাস তো বল তোর বাবু কোথায় আছে আর কি করছে?”
খেঁদু আর থাকতে পারল না। হেঁচে কেঁদে একটা বৃত্তান্ত সে জাহির করলে। গোবিন্দবাবু খুব মন দিয়ে শুনলেন। তারপর দুদ্দাড় করে উঠে এলেন তিনতলায়। নিচু ছাত। মাথা আর একটু হলেই ছাতে ঠুকে

যাবে।
"বলি তোর আক্কেল খানা কি রে? এসব কি?"
পটলবাবু একটা নকশা করছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিকপথে এগোচ্ছিল না। এখন বন্ধুর কাছে ধরা পড়ে গিয়ে একটু লজ্জিতই হয়ে পড়লেন। কি বলবেন কি করছিলেন? গোবিন্দ হয়তো হেসেই উড়িয়ে দেবে। নিরুপায় হয়ে সব কথা স্বীকার করতেই হল।
গোবিন্দবাবু সব শুনলেন। তারপর বললেন, "তা এখন কি নিয়ে গবেষনা হচ্ছে শুনি?"
"কি নিয়ে গবেষণা করব তাই নিয়েই –"
কথাটা শেষ করতে দিলেন না গোবিন্দবাউ, বললেন, "কালকে সকাল পাঁচটায়"

প্রবল অনিচ্ছা সত্তেও দু দিন পর সকালবেলা মর্নিং ওয়াকে বেরোতেই হল পটলবাবুকে। বাড়ি থেকে দু'পা এগিয়ে পার্কের এক কোনে একটা ভাঙা ট্যাক্সি দেখা গেল। নিঃসন্দেহে উড়ুক্কু ট্যাক্সিই হবে। ট্যাক্সি ঘিরে লোকের জটলা। এই সক্কালবেলাতেও এমন ধাক্কা লাগবে কেউ কল্পনাতেও ভাবেনি। গোবিন্দবাবু মুচকি হেসে বললেন, "ওহে সায়েন্টিস্ট। এই সমস্যার একটা সমাধান করো দেখি কেমন পারো? মানুষ তো সেই কবে থেকেই পাখি হতে চেয়েছে, পেরেছে কি?"

পটলবাবু প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন, "এ জিনিস কি আমি বানিয়েছি নাকি যে সারাবো, তৈরী করেছেন সরকারি বিজ্ঞানীরা, ওরাই বুঝবেন।" তারপর হঠাৎ করে কি মনে হওয়ায় থমকে গেলেন। সত্যিই তো! নিজের ল্যাবরেটরিতে বসে ঘষে মেজে রোবট বানিয়ে কি হবে? এর চেয়ে তো এত বড় সমস্যা রয়েছে হাতের সামনেই। ওদিকে গোবিন্দবাবু হাঁকালেন, "কিরে ব্যাটা এখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফাঁকি দিলে চলবে?"

পটলবাবুও পা চালালেন।

সেই মর্ণিং ওয়াকে গিয়ে গাড়ির অ্যাক্সিডেন্ট দেখার পর দু মাস কেটে গেছে। উড়ুক্কু ট্যাক্সিতে চেপে কলকাতার পুজো প্যান্ডেল আর আলোকসজ্জা দেখতে বেরিয়েছেন দুই বন্ধু। এই সবটাই সম্ভব হয়েছে পটলবাবুর জন্য। এর জন্যই আজ সর্বত্র পটলবাবুর জয়জয়াকার।

"তুই একটা কীর্তি করলি বটে বুড়ো। আমি তো ভেবেছিলাম তোর দ্বারা এসব কিচ্ছু হবে না"

বন্ধুর কথায় মনে মনে সত্যিই বেশ গর্ববোধ করলেন পটলবাবু। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, "ওরে বিজ্ঞানটাকে তো কোনদিন ভালোবেসে দেখলি না –যে কোনটা সম্ভব আর কোনটা নয়। তবে তোর কৃতিত্বও কম নয় রে গোবিন্দ। তুই না বললে আমিই কি কখনো এটা নিয়ে ভাবতাম।"

উড়ুক্কু ট্যাক্সি সমস্যার কিরকম সমাধান হতে পারে তা জানিয়ে পটলবাবু একটা চিঠি লিখেছিলেন বিজ্ঞান কাউন্সিলের প্রধানকে আর তাতে বলেছিলেন – অনেক প্রাণী, প্রজাপতি, পাখি পৃথিবীর চুম্বকশক্তি অনুভব করতে পারে। তারা যখন দলে দলে কোন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায় তখন এই ক্ষমতার প্রয়োগ করে। শহরের এক দিক থেকে অন্যদিকে উড়ে যাওয়া ট্যাক্সিরাও যদি এইভাবে পৃথিবীর চুম্বকশক্তির সাথে নিজের চুম্বকশক্তি সাজিয়ে নিতে পারে, তবে একদিকে উড়ে যাওয়া গাড়িগুলো একই সমতলে থাকবে। আর বেকায়দায় যদি কখনও দুটো গাড়ি সামনা সামনি এসে পড়ে? এ তো সব্বাই জানে যে চুম্বকের সমান মেরু একে অপরকে বিকর্ষণ করে।

বিজ্ঞানীরা সেই চিঠি একবার পড়লেন, দুবার পড়লেন। তারপর বললেন –সত্যিই তো। সঙ্গে সঙ্গে পটলবাবুর ডাক পড়ল। এত তাড়াতাড়ি আর এত সহজে যে এই সমস্যার সমাধান হবে তা কেউ ভাবতেও পারেনি। কাউন্সিলও যারপরনাই খুশি কারন ট্যাক্সিতে খুব বেশি কিছু বদলাতেও হল না।

আজকে ২০৫০ সালে যে কলকাতার বাঙালি এই প্রথম ট্যাক্সিতে চড়ে দুর্গাপুজো দেখছে, সেসব পটলবাবুর জন্যেই। তবে পটলবাবু ঠিক করেছেন এখানে থামার প্রশ্নই ওঠে না। তিনি আরেকটা চিঠি লিখবেন। কি নিয়ে তাই নিয়েই ভাবনাচিন্তা করছেন। তবে দিনরাত ছুটোছুটি, ব্যাডমিন্টন, লাইব্রেরী এসব সামলানোর পর আর সময় কোথায়।

অভ্র পাল
কলকাতা

ছবিঃ
কৌস্তুভ রায়
কলকাতা

অদ্-ভূত প্রতিশোধ

আজ জমিদার চণ্ডীকা চরণ চৌধুরীর পারলৌকিক কাজ – হৈ হৈ ব্যাপার। দুই মেয়ে সপরিবারে এসেছে এ ছাড়াও দূর দূর থেকে আসা অনেক আত্মীয় স্বজনে এত বড় জমিদার বাড়ি একেবারে গম গম করছে। দুপুরে জমিদারির ছয় সাতটা গ্রামের প্রায় হাজার দুয়েক লোক পাত পেড়ে খাবে পাশের মাঠে – সেখানে বিরাট বিরাট সামিয়ানা খাটানো হয়েছে আর একদিকে কলাপাতার ঢাঁই – আশে পাশের গ্রামের কারুর বাড়িতে কলাপাতা বলতে কিছু আর অবশিষ্ট নেই। শ খানেকের উপর গ্রামের লোক বেগার খাটছে মাঠে, রান্নার কাজে। রান্নার বিশাল আয়োজন – সে এক এলাহি ব্যাপার – সারা রাত ধরে হ্যাজাকের আলোতে গ্রামের জনা কুড়ি বৌ ঝি তরকারি কুটে পাহাড় বানিয়েছে আর সেই সাথে জোগালিরা মশলা বেঁটে পরাতের উপর স্তুপ করেছে – এখন পোস্ত বাটা চলছে। কাক ভোর থেকেই রান্না শুরু – জনা দশেক রাঁধুনী বিরাট বিরাট কাঠের উনুনে বড় বড় হাণ্ডা ও কড়াই চাপিয়েছে পোলাও, ফুলকপির কালিয়া, আলু পোস্ত, পায়েস, ইত্যাদি রান্নার জন্য – ওদের সাথে জনা পনের লোক খেটে চলেছে অবিরাম। সবার গলদঘর্ম অবস্থা – রান্না ভালো না হলে কারুর ঘাড়েই মাথা থাকবে না। দুদিন আগে থেকেই মিষ্টি তৈরির ভিয়েন বসেছে তিন চার ধরনের মিষ্টি, দৈ ও বোঁদে বানানোর জন্য তাই দূর শহর থেকে চার পাঁচ জন ময়রা এসেছে এই কাজে মানে ওদের ধরে আনা হয়েছে। বিরাট সব কাঠের পরাতে মিষ্টি ও বোঁদের পাহাড় হয়ে আছে আর শ দুয়েক গাড়িতে দৈ বসানো হয়েছে। জমিদারবাবুর বড় ছেলে কন্দর্প কান্তি চৌধুরী বাবার শেষ কাজ খুবই ধুমধাম করে করছেন যাতে জমিদারির সমস্ত লোক বলে, হয়েছিলো বটে খাওয়া দাওয়া জমিদারবাবুর শ্রাদ্ধে – জীবনে এত ভালো কোথাও খাই নি। জমিদারবাবুর পেয়ারের লেঠেলরা চার দিকে নজর রেখেছে – ওদের ভয়ে রাঁধুনী বা অন্যান্য কাজের লোক তটস্থ – কারুর মুখেই কোন কথা নেই – একটু এদিক ওদিক হলেই ঘাড় থেকে মাথা নেমে যাবে। জমিদারবাবুর দৌলতে এই লেঠেলদের সাত খুন মাপ – পুলিশের মুখ উপযুক্ত দক্ষিণাতে বন্ধই থাকে। অনেককে মেরে বিলের কাদায় পুঁতে দিয়েছে – গ্রামের কারুর টুঁ শব্দ করার উপায় নেই – বাড়ির লোক ভয়ে কাঁদতে পারে নি শ্রাদ্ধ তো দূরে থাক।

ভোর বেলা থেকে জমিদার বাড়ির বিরাট উঠানে সামিয়ানা খাটিয়ে চলেছে শ্রাদ্ধের কাজের আয়োজন – বড় বড় ঝুড়িতে ফুল, মালা আর তার সাথে কলা, আপেল, মুসাম্বি, বেদানা ইত্যাদি নানা রকমের ফল, সুগন্ধী বাসমতি চাল, জমিদারবাবুর পছন্দের সব রকম তরকারি ইত্যাদি – শ্রাদ্ধের দানের জন্য প্রচুর কাপড়, ধুতি ও অন্যান্য জিনিস পত্র গুছিয়ে রাখা হচ্ছে। শ্রাদ্ধের কাজ করছেন নর নারায়ণ তর্করত্ন মশাই – এই এলাকার সব থেকে বড় পণ্ডিত ও খুবই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। ছোট বেলায় নবদ্বীপের টোলে পড়াশুনা করে অনেক বছর বারাণসীতে শাস্ত্র চর্চা করেছেন – বেদ উপনিষদ একেবারে কন্ঠস্থ। গ্রামে ফিরে এসে নিজের একটা টোল খুলেছেন ওখানে জনা দশেক ছেলে বিনা পারিশ্রমিকে শাস্ত্র পড়ে। খুবই সাধারণ জীবন যাত্রা – কোন রকম অহংকার বা বাহুল্য নেই – বিয়েও করেন নি – স্বপাকেই খান। রোগা ছিপছিপে ফরসা চেহারা, মাথায় বেশ মোটা টিকি – বাকি চুল কামানো, কপালে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা – শীত গ্রীষ্ম বারো মাস পরনে সাদা ধুতি আর গায়ে একটা চাদর – সাধারণতঃ খালি পায়ে নয়তো খড়ম পরেই থাকেন তবে দূরে কোথাও যেতে হলে ক্যানভাসের জুতো। জমিদারবাবুর শ্রাদ্ধের কাজটা নিতে ওকে প্রায় বাধ্য করা হয়েছে – জলে থেকে তো আর কুমিরের সাথে বিবাদ করা যায় না – সকালে লেঠেলদের সর্দার নিজে এসে ওকে নিয়ে এসেছে। আজ কাজের জন্য উপবাস করেছেন – একেবারে বাড়ি ফিরে খাবেন। শ্রাদ্ধের কাজটা অবশ্য খুবই নিষ্ঠার সাথেই করছেন – শেষ হতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেলো। জমিদারবাবুর প্রেতাত্মার শান্তি ও অক্ষয় স্বর্গ লাভের ব্যবস্থা করে শ্রাদ্ধ শেষ করলেন। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান থেকে কিছুই নেবেন না – শেষে কন্দর্প কান্তি জোর করে এক বিঘা জমি ওর নামে দেবোত্তর করে দেওয়ার দলিলটা ধরিয়ে দিলেন। ওদিকে দুপুর থেকেই মাঠে খাওয়া দাওয়া চলেছে – যত খুশি খাও – পেট পুরে খেয়ে গ্রামের লোকজন ছেলে মেয়েদের হাত ধরে প্রয়াত জমিদারবাবুর জয়ধ্বনি দিতে দিতে বাড়ির পথ ধরেছে সঙ্গে বাড়ির মেয়েদের জন্য খাবারের পোঁটলা। যারা লোভে পড়ে অতিরিক্ত খেয়ে নিয়েছে তারা আশে পাশের গাছের ছায়াতে শুয়ে পড়েছে – হেঁটে বাড়ি ফেরার অবস্থায় নেই। থানার দারোগাবাবু ও সেপাইরা আজ বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত – খাওয়া দাওয়ার পর সবাইকে উপযুক্ত ভেটও দেওয়া হয়েছে।

গোধূলির শেষে অন্ধকার হয়ে আসার মুখে তর্করত্ন মশাই রোওয়ানা দিলেন নিজের গ্রামের দিকে। পথে পেরুতে হয় মস্ত বড় ঠগীর মাঠ – প্রায় মাইল খানেকের উপর চওড়া – পাথরের নুড়ি ভরা রুক্ষ উঁচু নিচু জমি – মাঝে মাঝে বহু পুরাতন বট ও অস্বত্থ গাছ বিরাট বিরাট ঝুরি নামিয়ে অনেকটা জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে – এদিক ওদিক শ্যাওড়া গাছ আর কাঁটা গাছের ঝোপ ঝাড়। মাঠের একধারে বিরাট একটা মজে যাওয়া বিল – শ্যাওড়া ও বাবলা গাছের জন্য ওদিকে যাওয়া প্রায় অসম্ভব – পুরো বিলটাই পচা কাদায় ভরা অনেকটা চোরা বালির মত – কিছু পড়লে ভুস্ ভুস্ করে কোথায় যে তলিয়ে যায় কেউ জানে না। রাত্রে বেলা মাঝে মাঝেই হুঁস হুঁস করে এদিক ওদিক আগুন জ্বলে ওঠে – আশে পাশের গ্রামের লোকের মধ্যে চলতি কথা যে বিলের কাদায় যাদের ফেলে দেওয়া হয়েছিলো তেনারাই রাত্রে আগুন জ্বালিয়ে ঘুরে বেড়ান। ঠগীদের সময় কেউই প্রাণ নিয়ে এই মাঠ পেরুতে পারতো না – কত লোককে যে মেরে এই বিলে ফেলে দিয়েছিলো তার হিসেব নেই – বড় দল করে দিনের বেলাতেই শুধু লোকে মাঠটা পেরুতো। এখন তো ঠগীদের দিন নেই তবে নামটা রয়ে গিয়েছে আর বদনামটা নানা মুখের গল্পে রং চং মেখে গ্রামের লোকের মনে ভিত গেড়ে নিয়েছে তাই সন্ধ্যের পর কেউই মাঠ পেরুতে সাহস করে না। তর্করত্ন মশাই অবশ্য এসব গল্প একেবারেই বিশ্বাস করেন না তবে সাপ খোপের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হয় – বড় বড় কাল কেউটেরা এখানে স্বাধীন ভাবেই ঘোরা ফেরা করে। আজও নিজের মনে শ্রীবিষ্ণুর সন্ধ্যারতির শ্লোকটা গাইতে গাইতে হন্‌হনিয়ে চলেছেন মাঠের

ভেতর দিয়ে তবে দৃষ্টি সজাগ রয়েছে বাসুকী নন্দনদের জন্য। হঠাৎ মনে হলো অন্ধকারের মধ্যে ভুঁইফোড়ের মত ওর পাশে কে যেন হাঁটতে শুরু করেছে – কোথা থেকে এলো, কি ভাবে এলো ঠিক হিসেব পেলেন না – তর্করত্ন মশাই দাঁড়িয়ে পড়লেন।

'পেন্নাম হই পণ্ডিত মশাই, জমিদার ব্যাটার স্বর্গে যাবার ব্যবস্থা তো করে এলেন – তা ওকে কি স্বর্গে ঢুকতে দেবে? চিত্রগুপ্তের খাতায় অনেক গুলো পাতা তো ওর কীর্তি কাহিনীতে ভরে আছে।'
দোর্দন্ড প্রতাপ জমিদার চণ্ডীকা চরণ চৌধুরী – যার ভয়ে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেতো – তার নামে এই ভাবে অশ্রদ্ধার সাথে কথা বলা এই প্রথম শুনলেন – লোকটার বুকের পাটা আছে বলতে হবে – কে জানে কোথাকার লোক,
'শাস্ত্রের যা বিধি সেই ভাবেই আমি করেছি – বাকিটা তো আমার হাতে নেই – ভগবানের যা বিধান সেটা তো হবেই। কেউই তা আটকাতে পারে না।'
'তা অবশ্য ঠিক – আপনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত – আপনার কাজ আপনি করে দিয়েছেন। তা পণ্ডিত মশাই, আপনাকে যে একটু কষ্ট করে আমার সাথে যেতে হবে।'
'এখন? কোথায়?? কেন???'
'সেটা গেলেই বুঝতে পারবেন – ভয় নেই বেশী দেরি হবে না – আমি আপনাকে বাড়ি পৌছে দেবো।'
নর নারায়ণ এবার বিপাকে পড়লেন – একে তো অন্ধকার মাঠের মধ্যে লোকটা হঠাৎই কোথা থেকে এলো সেটাই চিন্তার বিষয় তার উপর কোথায় যেতে হবে, কেন যেতে হবে কিছুই বলছে না – লোকটার হাব ভাবও যেন কেমন ধরনের – অশরীরি আত্মা নয় তো?
'দেখো ভাই, আমি সকাল থেকেই অভুক্ত – খুবই পরিশ্রান্ত – বাড়িতে গিয়ে স্বপাকে কিছু না খেলে যে আর চলতেও পারবো না। তাছাড়া বাড়িতে নারায়ণের সন্ধ্যারতিও তো করা হয় নি। তুমি না হয় কাল সকালে আমার বাড়ি এসো – তখন তোমার সাথে চলে আসবো।'
'মাপ করবেন পণ্ডিত মশাই, সকালে যে আমি আসিতে পারবো না। এক কাজ করা যাক – এখন রাত তো বিশেষ হয় নি – আপনি বাড়ি গিয়ে পূজা আর্চা, খাওয়া দাওয়া করে নিন – তারপর আমি আপনাকে নিয়ে আসবো।'

নর নারায়ণ বুঝলেন এ ছাড়ার পাত্র নয় আর কি এমন দরকারি কাজ যে রাত্রে বেলাতেই যেতে হবে? ব্যাপারটা খুবই ঘোরালো মনে হচ্ছে – বেঘোরে প্রাণটা না গেলেই হয় তবে খুবই নম্র ভাবে কথা বলছে এই যা ভরসা।

'ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছে মতই হবে।'
নর নারায়ণ বাড়ির কাছে আসতেই লোকটা হঠাৎ কোথায় যেন উবে গেলো।

সারা দিন অনিচ্ছার সাথে শ্রাদ্ধের কাজ করার পর নিজেকে কেমন যেন ক্লেদাক্ত মনে হচ্ছিলো – সোজা পুকুরে ডুব দিয়ে ভালো করে স্নান করে নিলেন তারপর নারায়ণের সন্ধ্যারতি করে খাওয়া দাওয়া শেষ করতে বেশ সময় লাগলো – ভাবলেন দেরি দেখে হয়তো ব্যাটা চলে গিয়েছে। বাড়ির বাইরে আসতেই দেখেন লোকটা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে,

'চলুন পণ্ডিত মশাই, মাঠের পাশেই আপনার জন্য পালকি রাখা আছে।'
মাঠের কাছে এসে দেখতে পেলেন বট গাছের নিচে একটা চার বেহারার পালকি দাঁড়িয়ে কিন্তু আশে পাশে কোন পালকি-বেয়ারা নেই। এবার নর নারায়ণের ভয় হলো – সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন ভৌতিক। সাহস করে বললেন,
'তোমার পরিচয় না দিলে বাপু তোমার সাথে যাওয়া তো সম্ভব নয়। তুমি কে? কোথা থেকে আসছো? কোথায় যেতে হবে? এর কিছুই তো বলো নি – তুমি যদি আমার প্রাণটা নিতে চাও আমার আপত্তি নেই – এই ত্রিসংসারে আমার কেউ নেই কিন্তু বিস্তারিত না জেনে আমি আর এগুচ্ছি না।'
'ছিঃ ছিঃ পণ্ডিত মশাই, আপনি সবার পরম শ্রদ্ধার পাত্র – এসব কথা ভাবলেও পাপ। আপনি ভয় পাবেন বলেই এত সময় আমার পরিচয় দেই নি। আমার নাম ছিলো পরান – অনেকদিন আগে খাজনার টাকা সময় মত দিতে না পারায় জমিদারবাবুর লেঠেলরা পিটিয়ে আধমরা করে এই বিলের কাদায় ফেলে দিয়েছিলো আর আমিও ভুস্ করে নিচে তলিয়ে গেলাম। এখন বুঝতেই পারছেন আমি জীবিত মানুষ নই তবে ভয় পাবেন না – আপনাকে সুস্থ শরীরে বাড়ি পৌছে দেবার দায়িত্ব আমার। আপনার সাথে আমাদের একটু আলোচনা আছে – একটু তাড়াতাড়ি করুন – জানেনই তো দিনের আলোতে আমরা বেরুতে পারি না।'

নর নারায়ণ বুঝলেন ওঁর ধারনাই ঠিক – এ তো প্রেতাত্মা আর নিয়ে যাবে আরো অনেক প্রেতাত্মার সাথে আলোচনা করাতে। শরীরটা শিউরে উঠলেও ভাবলেন যা হবার তা তো হবেই – ভবিতব্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেওয়াই ভালো – বাড়ি পৌছে দেবার কথা যখন দিয়েছে তখন দেখাই যাক। পালকিতে উঠে বসতেই দরজা বন্ধ হয়ে গেলো তারপর ওটা ভীষণ জোরে চলতে শুরু করলো যেন চারটে ঘোড়া পালকিটাকে নিয়ে দৌড়াচ্ছে। হয়তো পরানের মতই আরো কিছু ছায়া পালকিটাকে নিয়ে চলেছে তবে কোন দিকে যাচ্ছে সেটা বোঝা গেলো না। একটু পরে পালকিটা দাঁড়িয়ে পড়তে দরজা খুলে গেলো,
'আসুন পণ্ডিত মশাই আমরা পৌছে গিয়েছি।'
পালকি থেকে বেরিয়ে নর নারায়ণ দেখলেন বিলের ধারে একটা খোলা জায়গাতে এসেছেন – চারদিকে পরানের মত অনেক ছায়ার ভিড় আর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক ছায়াকে দেখিয়ে পরান বললো,
'পণ্ডিত মশাই, ইনি হলেন ভূতনাথ – অনেক বছর আগে এই গ্রামের মোড়ল ছিলেন। অহেতুক খাজনা বাড়ানোতে জমিদারের কাছে প্রতিবাদ করে নতুন খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেন। লাভের লাভ হলো এক রাত্রে ওর বাড়িতে লেঠেলরা আগুন ধরিয়ে দেয় আর সেই আগুনে পুড়ে ওর ছেলে মেয়ে ও স্ত্রী

মারা যান আর ওর আধ পোড়া শরীরের জায়গা হয় এই বিলের কাদায়। এখানে যাদের দেখছেন সবাই আশে পাশের গ্রামের বাসিন্দা ছিলো কিন্তু লেঠেলদের দয়ায় এদের ঠাঁই মিলেছিলো এই বিলের চোরা কাদায়। অপঘাতে মৃত্যু ও ভয়ে শেষ কৃত্য কেউ করে নি বলে এই ভূত জন্ম থেকে আমাদের তো আর উদ্ধার নেই। কন্দর্প কান্তি তো বাপের উপর দিয়ে যায় আর ওর বৌ একেবারে যোগ্য সহধর্মিনী – বাড়িতে ঝি চাকরদের তো পান থেকে চুন খসার উপায় নেই – একটু এদিক ওদিক হলেই চাবকে পিঠের ঝাল চামড়া তুলে দেয় আর আধমরাদের লেঠেল দিয়ে এই বিলে পাঠিয়ে দেয়। এই অত্যাচারের একটা বিহিতের জন্য আজ আপনাকে এখানে কষ্ট দিয়ে নিয়ে এসেছি যাতে ভবিষ্যতে যেন আর কাউকে এই ভাবে বিনা কারনে লেঠেলদের হাতে মরতে না হয় আর আশে পাশের সব গ্রামের লোক যেন সুখে সাচ্ছ্যন্দে বেঁচে বর্তে থাকতে পারে। আমরা সব চাষা ভূষো ছিলাম – আমাদের বুদ্ধিতে এই সমস্যার কোন সমাধান পাচ্ছি না।'

মানুষ যে কতটা অত্যাচারি হতে পারে তার কোন ধারনা নর নারায়ণের ছিলো না – আজ এক সাথে এত ঘটনা শুনে আর সেই অত্যাচারের ভুক্তভোগী এত প্রেতাত্মাদের দেখে মনে হলো মাথায় রক্ত উঠে যাচ্ছে। নর নারায়ণ নিজেকে সামলালেন – মাথা গরম করে কিছু করা যাবে না। গ্রামের লোকজনকে দিয়েও হবে না কারণ অত্যাচারের ভয়ে কেউই এগিয়ে আসবে না আর সরকারের আইন আদালতের সাহায্য চেয়েও কোন লাভ নেই – সবই জমিদারের হাতের মুঠোয়। ছায়ারা অনেক আশা নিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে – ওদের কাছে নর নারায়ণ হচ্ছেন এক মাত্র সহায়। মাথা নিচু করে অনেক ক্ষণ ভেবে ধীরে ধীরে বললেন,
'দেখো, আমি ব্রাহ্মণ – হিংসা বা খুন জখম আমার চিন্তায় আনাও পাপ। তবে চাণক্যও ব্রাহ্মণ ছিলেন কিন্তু বৃহত্তর জনতার স্বার্থে তিনিও কূট কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমার মনে হয় এর ব্যবস্থা তোমাদেরই করতে হবে – আর কোন উপায় নেই। তোমাদের তো ভয়ের কোন কারণ নেই – নতুন করে আর কোন ক্ষতি তো কেউ করতে পারবে না। প্রথমে লেঠেলগুলোর ব্যবস্থা করো – ওরাই জমিদারের প্রধান শক্তি – ওদের এক এক করে তুলে এনে এখানে বেঁধে রাখো আর এমন ভয় দেখাও যে বাছাধনদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয় – লেঠেলদের সর্দারকে সব থেকে আগে তুলবে।'

এর মধ্যে কোথা থেকে একটা ছায়া দৌড়ে এসে পরানকে বললো,
'পরানদা, এক্ষুনি একজন রাঁধুনীকে লেঠেলরা ওপাশে বিলের কাদায় ফেলে দিয়েছে – বেচারির দোষ হলো পায়েসে মিষ্টি কেন কম হয়েছে।'
'নাঃ, এভাবে আর চলতে দেওয়া যায় না – আজ থেকেই তোমরা কাজ শুরু করে দাও। সব কটা লেঠেল যেন আজ রাত্রেই এখানে চলে আসে – তারপর জলবিছুটির ডাল দিয়ে ওদের আচ্ছা করে চাবকাবে। আগামী কাল রাত্রে এরপর কি করা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।'
পর দিন সকালে সব কটা গ্রামে হৈ চৈ শুরু হয়ে গিয়েছে – একজন লেঠেলকেও পাওয়া যাচ্ছে না – এমন কি লেঠেলদের সর্দারও নেই। কন্দর্প কান্তি পেয়াদাদের সাথে বন্দুক নিয়ে চার দিকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন – হুমকি দিয়েছেন আজকের মধ্যে লেঠেলদের বের করতে না পারলে গ্রাম কে গ্রাম পুড়িয়ে দেবেন। গ্রামের লোকেরা ভয়ে দরজা বন্ধ করে হরিনাম জপছে। নর নারায়ণ মনে মনে হাসলেন – ওষুধ ধরেছে – এবার দ্বিতীয় পর্বের শুরু। সেদিন সন্ধ্যের পর নর নারায়ণকে পালকিতে করে পরান বিলের ধারে নিয়ে এলে নর নারায়ণ আশে পাশে কোথাও লেঠেলদের দেখতে পেলেন না তবে দূর থেকে ভেসে আসা আর্তনাদ শুনতে পেয়ে পরানের দিকে তাকাতে পরান হাসলো,
'পণ্ডিত মশাই, আপনার কথা আমাদের মনে সাহস জুগিয়েছে – মনে হচ্ছে অনেক দিন আগেই এটা

করা উচিত ছিলো। লেঠেল ব্যাটাদের তুলে আনতে কোন অসুবিধা হয় নি – সব কটাকে উড়িয়ে নিয়ে বিলের মাঝে একটা ছোট্ট দ্বীপে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে – ওখান থেকে কোন জ্যান্ত মানুষ চার দিকের চোরা কাদা পেরিয়ে জীবনেও এ পাড়ে আসতে পারবে না। আমাদের কয়েকজন জলবিছুটির চাবুক মেরে ওদের নাচ খুব উপভোগ করছে।'
'ঠিক আছে, এবার দ্বিতীয় পর্ব। আজ রাতেই তোমরা ওই জমিদার বাড়িতে ঢিল পাটকেল মারতে শুরু করো তবে কাউকে প্রাণে মারবে না আর কোন বাচ্চা বা মেয়েদের যেন কিছু না হয়। বাড়ির ভেতরে ও বাইরে বিলের পচা কাদাতে বাড়ি যেন বসবাসের অযোগ্য হয়ে যায় আর কন্দর্প কান্তিকে বিশেষ যত্নে ওর সাধের লেঠেলদের কাছে পৌছে দিও।'

মাঝ রাতে জমিদার বাড়িতে প্রচণ্ড গণ্ডগোল শুরু – চারদিক থেকে ইট পাটকেল পড়তে শুরু করেছে। দারোয়ানরা গেটের পাশে খাটিয়াতে ঘুমাচ্ছিলো – ওদের গোঁফ, টিকি আর চুলের মুঠো ধরে উঠিয়ে কারা যেন সমস্ত মুখে গায়ে পচা গোবর আর কাদা মাখিয়ে দিলো। দুর্গন্ধের চোটে ওরা দৌড়ালো পুকুরের ডুব দিতে – পুকুরে নামতেই শুরু হয়ে গেলো চোবানো – হাস্‌ফাস্‌ করে জল থেকে মাথা তুললেই আবার জলে ডুবিয়ে দিচ্ছে – প্রায় আধ মরা অবস্থায় ছাড়া পেয়ে পুকুরের জলে পেট ফুলিয়ে কোন রকমে পাড়ে উঠে ওখানেই ওরা পড়ে রইলো। চেঁচামেচি শুনে পেয়াদারা বন্দুক নিয়ে ঘরের বাইরে এসে কিছুই দেখতে না পেয়ে ভয়ে এলো পাথারি গুলি চালাতে শুরু করতে হঠাৎ বন্দুকগুলো ওদের হাত থেকে বেরিয়ে উড়ে পুকুরের জলে ডুবে গেলো আর কারা যেন ওদের ধুতি লুঙ্গি টান দিয়ে খুলে হাওয়াতে ভাসিয়ে দিলো। পেয়াদারা প্রাণের ভয়ে পাঁচিল টপকে বাইরে যেতেই কারা ওদের পেছনে জলবিছুটির চাবুক মারতে মারতে গ্রামের বাইরে বের করে দিলো। এর মধ্যে সবাই হতবাক হয়ে দেখলো কন্দর্প কান্তি হাওয়াতে ভেসে চলেছেন আর আগে আগে ওর সিল্কের লাল লুঙ্গি পতাকার মত চলেছে – রাতের অন্ধকারে কন্দর্প কান্তি কোথায় হারিয়ে গেলেন কেউ জানলো না। এদিকে বাড়ির সমস্ত দরজা জানালা ভেঙ্গে প্রত্যেকটা ঘরের জিনিষ পত্রের একেবারে লণ্ড ভণ্ড অবস্থা – পচা গোবর, কাদা আর আবর্জনাতে বাড়ি ভরে গিয়েছে – দুর্গন্ধে টেঁকা যাচ্ছে না। রান্না ঘরের সমস্ত বাসন কোসন পুকুরের জলে ডুবে গেলো – উনুন ও অন্যান্য জিনিষ ভেঙ্গে একাকার অবস্থা। জামা, কাপড়, বিছানা, ইত্যাদির ছেঁড়া টুকরো বাগানের গাছে ঝুলছে। বাচ্চারা ও মেয়েরা ভয়ে তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করেছে তবে এর মধ্যে জমিদার গিন্নীর বিলাপই সব থেকে বেশী। আধ ঘন্টা খানেক তাণ্ডব চলার পর হঠাৎ সব কিছু ঠাণ্ডা হয়ে গেলো যেন কাল বৈশাখির ঝড় থেমে যাওয়ার ঠিক পরের অবস্থা। ঝি চাকররা সব ভয়ে পালিয়ে গিয়েছে – বাড়ির বাকি লোকজন রাতটা বাইরের মাঠে বসে কাটালো। গোলমাল শুনে গ্রামের লোকেরা সব বেরিয়ে এসেছিলো কিন্তু ভয়ে দূর থেকেই দেখেছে – কাছে আসার সাহস কারুরই হয় নি।

ভোরের আগেই দারোয়ানরা পুকুর পাড় থেকে কোন রকমে উঠে পালিয়ে গেলো নিজেদের বাড়ি আড়া ছাপড়ার দিকে – এত বড় বাড়ি একেবারে শুনশান। সকাল বেলাতেই চণ্ডীকা চরণের মেয়েরা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনরা এক কাপড়ে রওয়ানা দিলো নিজেদের বাড়ির দিকে – টাকা পয়সা, সোনা দানা, কাপড় চোপড় সবই রয়ে গেলো বাড়ির ভেতরে পচা কাদা ও গোবরে মাখামাখি হয়ে। শুধু জমিদার গিন্নী একা বুক চাপড়ে কেঁদে গেলেন সারা দিন – ওকে সান্তনা দেওয়ারও কেউ রইলো না। বিকেলের দিকে নর নারায়ণ হাজির হলেন গ্রামে যেন এই মাত্র খবর পেয়েছেন। ওকে দেখে গ্রামের লোক ঘিরে ধরেছে – হাজার প্রশ্ন চার দিক থেকে। নর নারায়ণ ধীরে ধীরে বললেন,
'সবই ভগবানের বিচার – বোধ হয় পাপের পাল্লা বেশী ভারি হয়ে যাওয়াতে স্বয়ং মহাদেব নিজের

চেলা চামুণ্ডাদের পাঠিয়েছিলেন শাস্তি দেওয়ার জন্য না হলে এরকম ঘটনা তো ঘটতে পারে না। আমার মনে হয় কারুরই ও বাড়িতে ঢোকা আর উচিত হবে না।'

গ্রামের সাধারণ মানুষ এক বাক্যে স্বীকার করে নিলো পণ্ডিত মশাইর কথা। বয়স্ক লোকেরা মাথা নেড়ে বললো,

'পণ্ডিত মশাই সর্বজ্ঞ – উনি ঠিকই বলেছেন – এ রকম ভূতের নেত্যর কথা তো আমরা বাপের জন্মেও শুনি নি। ওই বাড়ির ত্রিসীমানায় আমরা আর যাচ্ছি না।'

সেদিন রাত্রে বিলের ধারে আবার জমায়েত – ছায়ারা সবাই ভীষণ খুশি – ওদের আনন্দ দেখবার মত – অনেকে তো চারদিকে নেচে বেড়াচ্ছে। নর নারায়ণ সবাইকে থামিয়ে দিলেন।

'এবার সব থেকে দরকারি কাজ – আমি ভূতনাথকে অনুরোধ করবো জমিদারির সমস্ত গ্রামে অরাজকতা শুরু হবার আগেই এক জন করে মোড়ল ঠিক করে দিতে – নাম পরিচয় জানালে আমি নিজে প্রত্যেকটা গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে মোড়ল নির্বাচন করে দেবো। জমিদার বাড়িতে যত টাকা পয়সা, সোনা দানা চার দিকে ছড়িয়ে আছে সেগুলো এক জায়গায় জড়ো করে সিন্দুকে ঢুকিয়ে লুকিয়ে রাখতে হবে। কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো কিছু সাহসী লোক টাকা পয়সার লোভে ওই বাড়িতে হানা দিতে পারে তাই তোমাদের কয়েকজনকে বাড়ি পাহারার জন্য ওখানে থাকতে হবে। এই সবের বিলি ব্যবস্থা কি ভাবে করা হবে সেটা ভূতনাথের সাথে বসে তোমরাই ঠিক করবে। চণ্ডীকা চরণ যাদের জমি জবর দখল করেছিলো তার সমস্ত দলিল সিন্দুক থেকে বের করে আসল মালিকদের ফেরৎ দিয়ে দাও। গ্রামের যারা এত দিন জমিদারের দালালি করতো ওদের জলবিছুটির কয়েক ঘা দিয়ে ছেড়ে দেবে তার বেশী দরকার হবে না। জমিদার বাড়িও যেন ধ্বংস স্তুপে পরিনত হয় যাতে কেউ কোন দিনও ওখানে বসবাস করতে না পারে। এই সমস্ত কাজ শেষ হবার পরই তোমাদের ছুটি – পরানের কাছে সব কিছু ভালো ভাবে শেষ হবার খবর পেলে আমি বিশেষ পূজা এবং শ্রাদ্ধ করে তোমাদের সবার এই ভূত জীবন থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করবো।'

ছায়ারা নরনারায়ণের জয়ধ্বনি দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করলো – ওদের সবার মনে এই ভূত জীবন থেকে চিরতরে মুক্তির আশার আলো।

অঞ্জন নাথ
ব্যাঙ্গালোর, কর্ণাটক

ছবিঃ
কৌস্তুভ রায়
কলকাতা

সব পেয়েছির দেশে

যেখানে আকাশ টা ঘন নীল,আরও বড় আর ঝলমলে,কচি কচি,থোপা থোপা মেঘেরা ডানা মেলে উড়ে বেড়ায় সেইরকম জায়গায় পুজোর ছুটি কাটাতে ইচ্ছে করে মেঘনার।

কিন্তু সেটা তো হওয়ার নয়।যেদিন ওরা গ্রাম ছেড়ে ওই ঘিঞ্জি শহরটায় এসে উঠেছে সেদিন থেকে ওর মন খারাপ।পুজো আসছে বলে মনেই হয় না।

বেশ তো ছিল গ্রামে। মহালয়ার সকালে দাদুর কাছে বসে রেডিয়োতে দুর্গাবন্দনা শুনতে ওর কত ভাল লাগতো।দারুণ কাটতো পুজোর দিনগুলো।এখন জানলা দিয়ে দু একটা সাদা মেঘ মাঝে মাঝে হাতছানি দিয়ে যায়।চুপিচুপি বলে মেঘনা এত উদাস কেন?আমাদের সঙ্গে এসো,তোমাকে আমরা পিঠে করে নিয়ে যাব সেই সব পেয়েছির দেশে যেখানে সবুজ গাছপালা,নানা রঙের ফুল,হরেক রকম পাখি আর মিষ্টি ঝিরঝিরে নদী আছে।সব পেয়েছির দেশ কথাটা মনে পড়লেই মেঘনার বুকের ভেতর টা আনন্দে ভরে ওঠে।পূর্ণদাদা বলেছিল একটা সব পেয়েছির দেশ নাকি সত্যি আছে।সেই দেশটাকে শুধু খুঁজে বের করতে হবে।ছুটি পড়লেই মেঘনা আর পূর্ণদাদা বেড়িয়ে পড়ত অ্যাডভেঞ্চারে।পূর্ণদাদা এমন সব যায়গার কথা জানত যার কথা ও কোনদিন শোনেনি।মেঘনা অবাক হয়ে ভাবত,এত কথা পূর্ণদাদা জানলো কি করে! পূর্ণদাদা তো একদম পড়াশোনা করে না।

সে বলে এই পৃথিবীটা একটা বিরাট বই এইটাকে জানতে পারলেই আসল পড়াশোনা করা হবে।

আর তার জন্য আমাদের অ্যাডভেঞ্চারে যেতে হবে।নতুন নতুন জিনিস খুঁজে বের করতে হবে।

তাই সকাল থেকেই মেঘনা আর পূর্ণদাদা বেরিয়ে পড়ত সেই দেশটার খোঁজে।ওদের বাড়ি থেকে একটু দুরে একটা নদী আছে। সেই নদীর জল খুব স্বচ্ছ,একেবারে আয়নার কাঁচের মতো।সেখানে অনেক কাঁকড়াও আছে।পূর্ণদাদা কাঁকড়া ধরত।নদীর ধারে রংবেরংএর পাথর পড়ে থাকত।
লাল,নীল,সবুজ, ভারী অদ্ভুত দেখতে পাথরগুলো।পূর্ণদাদা বলত ওই পাথরগুলোয় হাত দিস না।
দিনেরবেলা ওরা পাথর কিন্তু রাত্রিবেলায় ওরা পরী হয়ে যায়
মেঘনা চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করত,এখানে পরী আসে?পূর্ণদাদা বলত, কেন আসবে না,তবে ওরা কি আমাদের সামনে আসবে?ওরা আসে রাতের অন্ধকারে
যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে তখন।
-তুমি দেখেছ?
-হ্যাঁ
-কবে দেখলে?
-কাউকে বলিসনা যেন।একদিন অনেক রাত্রে চুপি চুপি এসে ছিলাম।হঠাৎ দেখি পাথরগুলো জ্বলছে। তারপর দেখি ছোট্ট ছোট্ট পরী জোনাকির মতো উড়ে বেড়াচ্ছে।
জায়গাটাকে কি অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল তখন।তুই আসবি,তোকেও দেখাব।মেঘনা বলত, না বাবা,আমার ভয় করবেনা বুঝি!
এমনই একদিন পূর্ণদাদা এসে বলল,ব্যাঙ্গমার ডিম আনতে যাবি?মেঘনা তো রূপকথায় পড়েছিল ব্যাঙ্গমা পাখির কথা।সে পাখি সত্যি আছে নাকি?
কিন্তু পূর্ণদাদা যখন বলেছে সত্যি হতেও পারে।মেঘনা দের বাড়ির কাছে একটা ছোট্ট জঙ্গল আছে। ঘন গাছপালায় ঘেরা।বন্য জন্তু বিশেষ নেই।
সেই জঙ্গলের একটা উঁচু গাছের মাথায় পূর্ণদাদা আবিষ্কার করেছে ব্যাঙ্গমা পাখি, সত্যি সত্যি ভারী

অদ্ভুত দেখতে পাখিটা।ঠোঁট গুলো লম্বা বাঁকানো,
রংটা বাদামী আর সাদাতে,সবুজ রঙের বড়বড় চোখ দুটো। খানিক বাদেই উড়ে গেল মা পাখিটা।
পূর্ণদাদা খুব ভালো গাছে চড়তে পারে।তখনি গাছে উঠল।
খানিকবাদেই গাছ থেকে নেমে এল।হাতের মধ্যে একটা কি যেন খুব সাবধানে ধরে এনেছে।
-তোমার হাতে কি?
-ব্যাঙ্গমার ছানা!
-ইস কি সুন্দর দেখতে!
-খুব সাবধানে রাখবি কিন্তু।কেউ যেন টের না পায়।
-আচ্ছা বাবা ঠিক আছে।
কিছুদিন বাদেই ছানাটা বেশ বড় হয়ে উঠল।সাদা আর বাদামী রঙের পালকে তার কচি গা ঢেকে গেল।কথাটা আর চেপে রাখতে পারেনি মেঘনা,বলে ফেলেছে দাদু কে।অবশেষে সেই অদ্ভুত পাখিটার কথা উঠে এলো খবরের কাগজে।এর ফল মোটেই ভালো হয়নি।ওরা একদিন জঙ্গলে এসে দেখে সেই গাছটার নীচে ছড়িয়ে আছে পাখিটার পালক আর রক্তের দাগ।পূর্ণদাদা ভীষণ কেঁদেছিল।দাদু সঙ্গে সঙ্গে খবর দিয়েছিলেন তাঁর এক বন্ধুকে। তিনি থাকেন উত্তরপ্রদেশে।পাখি নিয়ে গবেষনা করেন।পরদিন সকালেই তিনি চলে এলেন মেঘনা দের বাড়িতে।তিনি পালক গুলো পরীক্ষা করে বললেন যে,এ এক বিরল প্রজাতির পাখি এদের বাসস্থান গ্রানাডায়।।এদের মাংস খুব সুস্বাদু।এই জন্যই এদের প্রাণ দিতে হয়।কিন্তু এই গ্রামে এই পাখির দেখা পাওয়া -এ তো খুব চমৎকার ব্যাপার!এই প্রজাতি কে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে।আমি আজই বনদপ্তরের লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। পূর্ণদাদাও লেগে পড়ল কাজে।ওই রকম আরও অনেকগুলো পাখির সন্ধান পাওয়া গেল ওই জঙ্গলে।

একদিন ধরা পড়ল চোরাশিকারীর দল। পূর্ণদাদাই খবরটা দিয়েছিল দাদু পিঠ চাপড়ে বললেন, সাবাস পূর্ণেন্দু,তুমি দারুণ কাজ করেছ,এর জন্য তোমার পুরস্কার পাওয়াউচিৎ।দাদুর সেই বন্ধু পূর্ণদাদার গলায় পরিয়ে দিলেন একটি সোনার মেডেল, যেটি তিনি ওই বিচিত্র পাখির খোঁজের জন্য পেয়েছিলেন।
আজ সেই গ্রাম ছেড়ে এতদুরে এই ঘিঞ্জি শহরের দোতলা বাড়িটায় এসে মেঘনার মনে হয়,ওই গ্রামটাই ছিল যেন সব পেয়েছির দেশ আর পূর্ণদাদা সেই দেশের রাজপুত্র।সেইদেশের গাছপালা, পশুপাখি সবকিছু রক্ষার ভার তার হাতে।

এ সমস্ত ভাবতে ভাবতে আনমনে পড়ার বইটা খুলল মেঘনা।
অমনি জানলা দিয়ে মিষ্টি হাওয়ায় উড়ে এল একটা পালক।
পালকটা সাদা আর বাদামী রঙের।

দ্বৈতা গোস্বামী
ব্যাঙ্গালোর, কর্ণাটক

ছবিঃ
কৌস্তুভ রায়
কলকাতা

মিষ্টি নিমপাতা

নেহা বড় হয়েছে। বছর পনের বয়েস। পরের বছর মাধ্যমিক। বোর্ডের প্রথম পরীক্ষা। নেহা খুব সিরিয়াস ছিল এতদিন পড়াশুনোর ব্যাপারে। ইদানিং কম্পিউটার একটু বেশি সময় খেয়ে নেয় তার। মায়ের কাছে এই নিয়ে বকুনিও কম শুনছে না। তবুও তার হেলদোল নেই।

মা কিছু বললেই বলে "লাইট, লাইট"

মা জোরে কথা বললেই বলে "চিল, চিল"

মা পড়তে বসতে বললেই বলে "কুল, কুল"

মা বলে "কি কুলুক্ষণেই এই কম্পিউটারটা কিনে দিলাম তোকে, বোর্ড পরীক্ষার পর দিলেই হত"

নেহা বলে "কাম অন মা, কম্পিউটার তো স্কুলেই কিনতে বলেছিল, উফ্, তুমি এত টেনশান করোনা যে কি বলব! রিল্যাক্স মা রিল্যাক্স! আমাকে আমার মত থাকতে দাও না মা"

মা আবার নিজের কাজে ফিরে যান। ভাবেন সত্যি তো! আমাদের এত চিন্তা! আমাদের মা তো

আমাদের বোর্ডের পরীক্ষার আগে এমন করে টেনশন করত না, আমি বোধ হয় একটু বেশি বাড়াবাড়িই করছি।

পরক্ষণেই মায়া হয় নেহাটার জন্যে। এই একরত্তি মেয়েটা আমার; হঠাত কেমন যেন বড় হয়ে গেছে। আর পড়াশুনোতে তো বরাবরই ভালো করে নেহা। ফ্রিজ খুলে একটা গ্লাসে ম্যাঙ্গো-পাল্প, বরফকুচি, দই আর একস্কুপ আইসক্রিম দিয়ে চট করে বানিয়ে ফেলেন মকটেল। "এনে নেহা, খেয়ে নে তো এটা " নেহা বেজায় খুশি হয়ে আবার মন দেয় কম্পিউটারে। মা চলে যান নিজের সেলাইফোঁড়াই, টুকিটাকি ঘর্-গেরস্থালির কাজে। আবার ভুলে যান নেহার মাধ্যমিক-প্রসঙ্গ। এমন ভাবেই চলতে থাকে.. কম্পিউটারের স্ক্রিন সেভারের মত। একবার মাধ্যমিক আর পরক্ষণেই নেহার পড়াশোনায় নিষ্ক্রিয়তা, কম্প্যুটার অনুষঙ্গ, সোশ্যালনেট...

বাবা বাড়ি এলে রাতে খাবার টেবিলে নেহার সারাদিনের সব প্রশ্নর উত্তর খোঁজার চেষ্টা শুরু হয়। রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে বাবা একে একে সলভ করেন। খুবই গুরুগম্ভীর সে আলোচনা। ত্রিকোণমিতির সেই প্রবলেমটা, ফিজিক্সের সেই মেকানিক্সের পুলির অঙ্কটা, কম্পিউটারের প্রোগ্রামিং, কেমিস্ট্রির সেই ভয়াবহ ব্যালেন্সিংটা, কিম্বা আর কিছু না হোক জিওমেট্রি বই বাঁহাতে খুলে একটা খতরনাক রাইডার। বাবা আর মেয়ের সারাদিনের মোলাকাতের সময় এই একটাই। আর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর বাবা হিসেবে তিনি যতটা পারেন প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা চালিয়ে যান। টেবিল জুড়ে চলতে থাকে টেষ্টপেপারের চাপান-উতোর। বেচারী মা কোণঠাসা হয়ে যান। মেয়ের যত পড়া বাবাকে দেখলে মনে পড়ে যায়। নেহা একসময় বলে ওঠে "জানো বাবা? আজ ফেসবুকে স্তুতি বলছিল এবার নাকি আমাদের কোয়েশ্চেনে রিডিং টাইম দেওয়া হবে"

মা সেই অছিলায় একটু নালিশের ভঙ্গীতে বলে ওঠেন "আচ্ছা শোনো, তুমি কিন্তু ওকে এই কম্পিউটার করার সময়টা একটু বেঁধে দিলে ভালো হয়; আমি বললেই বলে ফেসবুক, অর্কুটে বন্ধুদের সাথে পড়ার কথাই তো বলছি"

নেহা বলে ওঠে "এই শুরু হল, বাবা দেখো আমি পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে একটু রিলাক্স করি। খেলাধূলো করিনা, নাচটাও এবছর মা বন্ধ করে দিল ; মা কেবল আমার পড়া, পড়া, পড়া এই নিয়ে আমার পেছনে সারাদিন পড়ে থাকে। আমি পড়ছি, না কম্পিউটারে গেম খেলছি সারাদিন তাই মায়ের চিন্তা। বাবা "সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে"র মত নেহা আর তার মায়ের মাঝামাঝি থেকে বললেন "নো চাপ, তোমরা পারোও বটে!"

"আচ্ছা বাবা তুমিই বলো আমাদের এই যুগটাতে সোশ্যাল নেট না জানলে আমি তো কমপ্লিটলি পিছিয়ে পড়ব দুনিয়া থেকে। পড়াশুনো করে পরীক্ষা পাশ হবে কিন্তু সোশ্যাল নেটে না ঢুকলে আমায় বন্ধুরা ছি ছি করবে। আর আমার পরীক্ষার রেজাল্টটা দেখো। হ্যাঁ, এবার না হয় আমি অঙ্কে আগের বারের চেয়ে কম পেয়েছি তার মানেই কি আমি পড়ছি না? তুমি বলো বাবা!"
"ঠিক আছে, এবার থেকে মায়ের কথা শুনে ঘড়ি ধরে কম্পিউটারে থেকো " বাবা বললেন।
"মা, তুমিও তো যখন বাবার ল্যাপটপে ব্রাউস করো তখন তোমার খেয়াল থাকে? সেদিন তো তোমার গ্যাসে দুধ পড়ে গেল। আরেকদিন ওই টিভি সিরিয়াল দেখতে গিয়ে আভেনে কেক পুড়ে গেল। প্লিজ মা, আমাকে একটু বোঝার চেষ্টা করো" নেহা বলে।
মায়ের বিরুদ্ধে এহেন অনস্থা প্রস্তাবে মা'র নেহার ওপর খুব অভিমান হল।

"একি তুমি খাবে না?" বাবা বললেন।

মা বাকি খাবার দাবার ফ্রিজে তুলে রেখে নেহার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন "তোমার আস্কারায় আজ মেয়ে এত বাড় বেড়েছে। বাড়িতে থাকলে জানতে ও কতক্ষণ পড়ছে আর কতক্ষণ ঐ ফেসবুক আর অর্কুটে সময় দিচ্ছে"

নেহা মায়ের সাথে কথা বলল না আর মাকে একবারের জন্য সাধলোও না, খেয়ে নেওয়ার জন্য। বেচারা মা ঘরে গিয়ে অন্ধকার করে শুয়ে পড়লেন। মনে মনে ঠিক করলেন আর কোনোদিন নেহার পড়াশোনার ব্যাপারে কোনো মাথা ঘামাবেন না। ও যা ভালো বোঝে তাই করুক। নেহার মাধ্যমিক নিয়ে আজ থেকে তাঁর আর কোনো দায় নেই। নেহা তার ঘরে গিয়ে যথারীতি কম্পিউটার অন করল আর জিটকের সবুজ হাতছানিকে উপেক্ষা করতে না পেরে বকে চলল অনর্গল। কত বন্ধু, কত পড়ার আলোচনা আর নতুন নতুন মুখোরোচক গসিপ। মাঝরাতে কখন সে শুয়ে পড়েছে তার খেয়াল নেই। মা এসে ঘরের আলো নিবিয়ে কম্পিউটার অফ করে চলে গেছেন সে জানেও না।

নরমে গরমে চলছিল নেহার পড়ালেখা সাথে সোশ্যালনেটওয়ার্কিং, নতুন বন্ধুত্ব আর মাধ্যমিকের প্রস্তুতি। হঠাত ফেসবুকে তার বন্ধুত্ব হল নিমপাতার সাথে, প্রোফাইলে নিমপাতার ছবি। মেয়ে একটা, বয়স লেখা নেই। ইমেল এড্রেসও নেই। মেয়ে দেখে বন্ধুত্ব করে ফেলল আর রোজ কথা হতে লাগল। বেশ ভালো লাগছিল সেই মূহুর্তগুলো নেহার। রাত হলেই মা-বাবার ঘরের আলো নিবে যায় আর নেহার শুরু হয় সেই সবুজ আলোর মোম জোছনা, নতুন বন্ধুর সাথে কথা। খাওয়াদাওয়া, গল্পের বই, সিনেমা, গান কত কিছু জানে এই মেয়েটা আর নেহার ভালোলাগা গুলোর সাথে মিলেমিশে একাকার হয়।

.....

নেহা : তুমি আমার চেয়ে কি বয়সে বড়? আমি এখন ষোলো ছুঁই ছুঁই। আর তুমি?
নিমপাতা : কি হবে জেনে? বেশ তো আমরা বন্ধু আছি এখানে। তোমার স্কুল কখন?
নেহা : সকালে আটটায় আর বাড়ি ফিরি একটায়
নিমপাতা : তোমার বেষ্ট ফ্রেন্ড কে?
নেহা : এতদিন আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু ছিল আমার মা। এখন আর মা আমার বন্ধু নেই গো।
নিমপাতা : ধুস্ মা আবার কারো প্রিয় বন্ধু হয় নাকি? মা তো খালি শাসন করে, বকুনি দেয়, মারধোর করে
নেহা : না গো, আমার মা তেমন ছিল না। ইদানিং আমার মাধ্যমিক যত এগিয়ে আসছে মা তত যেন আমার সাথে কেমন করছে আর আমার এই কম্পিউটার খোলার ব্যাপারে মায়ের সাথে রোজ রোজ অশান্তি ; এখন মা আমার সাথে কথা বলছে না। আমিও বলিনা, শুধু দরকার ছাড়া।
নিমপাতা : তুমি এখন বুঝবে না। যখন তুমি মা হবে তখন বুঝবে।
নেহা : তুমি তাহলে আমার চেয়ে অনেক বড়। এমন বড়দের মত কথা বলছ যখন
নিমপাতা : যাকগে ওসব কথা, তোমার কি খেতে সবচেয়ে ভালো লাগে? আমার যেমন চাইনিজ।
নেহাঃ আমার তন্দুরি খেতে বেষ্ট লাগে। জানো? মা আমায় এত ভালোবাসে আমি তন্দুরী খেতে চাই বলে বই পড়ে, টিভি দেখে মা সব তন্দুরী রান্না বানায় আমার জন্যে।
নিমপাতা : বাবা! তুমি কি লাকি গো! আমাদের মা কিন্তু এমন না। আমরা অনেক ভাইবোন। মা কার কথা রাখবে বলো? এ বলে মাছের ঝোল, ও বলে ঝাল, ও বলে মাছ খাব না ...কিন্তু আমরা খুব মায়ের বাধ্য ছিলাম। মা যা করে দিত সেটাই হাসিমুখে খেয়ে নিতাম। আর কোনো কোনো দিন

বায়না করলে মা বলত তোমরা হাত লাগাও আমার সাথে আমি বানিয়ে দিচ্ছি।

নেহা : আমার মা আমাকে খুব প্যাম্পার করে, কোনো কাজ করতে দিতে চায় না। আমার সব জিনিসপত্র গুছিয়ে দেয়। আমি রোজ স্কুল থেকে ফিরে বইয়ের ব্যাগ সোফায়, স্কুলড্রেস খাটে ফেলে দিয়ে টিউশানের জন্যে তৈরী হই। মা সব জায়গায় তুলে রাখে আর আমাকে কেবল বলে তুই শুধু মন দিয়ে লেখাপড়াটা করে যা।
নিমপাতা : আমার মা আবার ঠিক উল্টো।মা বলতেন রোজ চা করতে হবে তোমাকে সকালে উঠে আর বিছানাটা ঝেড়ে গুছিয়ে রেখে তারপর পড়তে বসতে হবে। আমি বলতাম, মা আমার যে বড্ড পড়ার চাপ। মা বলতেন সারাদিনে ওইটুকু কাজ করে পড়াশোনা করলে কোনো ক্ষতি হবে না।
নেহা : তুমি করতে সব আর তারপর পড়তে?
নিমপাতা : হ্যাঁ,মায়ের মুখের ওপর কথা বলব কি! মায়ের চোখের দিকে তাকালেই মনে হত মা ই ঠিক বলছে। যা বলছে আমার ভালর জন্যে বলছে।
নেহা : তোমার মা তোমাকে নিয়ে সিনেমা যেত?
নিমপাতা : হ্যাঁ, আমরা মায়ের সাথে সত্যজিত রায়ের ছবি, শরতচন্দ্রের গল্প নিয়ে ছবি, কিম্বা শরদিন্দুর ব্যোমকেশ বক্সী দেখতে যেতাম।
নেহা : আমিও মায়ের সাথে সবকটা হ্যারি পটার দেখেছি। নার্নিয়াও দেখেছি। আর লর্ড অফ দ্য রিংস দেখেছি বাবার সাথে, তুমি দেখনি?
নিমপাতা : না আমার দেখা হয় নি এখনো।
নেহাঃ অনেক রাত হল। এবার শুতে হবে। মা নয়ত কাল সকালে আবার মুখ ভার করে থাকবে।
নিমপাতা : কাল সকালে না হয় স্কুল নাই বা গেলে, আবার তোমার সাথে চ্যাট করব আমি।
নেহা : ওরেব্বাবা, কাল স্কুল না গেলে আমার ইউনিট টেষ্টের মার্কস জানতে পারবো না যে। আর তাহলে মা যে আরো রেগে যাবে।
নিমপাতা : তুমি তো দেখছি মাকে খুব ভয় করো।
নেহা : না গো, ভয় করিনা, ভালোবাসি। আমার মা খুব ভালো মানুষ। শুধু আমাকে নিয়ে বড্ড চিন্তা করে।
নিমপাতা : বাহ্, তুমি মা কে খুব ভালোবাসো.. শুনে আমার খুব ভালো লাগল। তাহলে মা কে নিয়ে কাল স্কুল থেকে আমার বাড়ি চলে এসো। আলাপ হবে তোমার সাথে, তোমার মায়ের সাথে।
নেহা : না গো পরীক্ষার পর যাবো একদিন। এখন থেকে আমাকে বোর্ডের এক্সামের জন্য বাড়তি পড়তে হবে। এখন আর অত বেড়ানো চলবে না।
নিমপাতা: বেশ তাহলে গুডনাইট!
নেহা : গুড নাইট, আজকের মত।
নেহা কম্পিউটার বন্ধ করে আলো নিবিয়ে শুতে যাবে, মনে পড়ে গেল স্কুলের ল্যাব-খাতা জমা দেওয়ার কথা। চোখে মুখে জল দিয়ে এসে হাত মুছে শুরু করে দিল লেখা।
রাত তখন একটা। শেষ হল খাতা লেখা। টেবিলে গিয়ে স্কুলের ব্যাগ গোছতে যাবে মনে পড়ে গেল শ্রুতি মিস রেফারেন্স বই থেকে দশটা করে অঙ্ক রোজ কষে আনতে বলেছিলেন। কাল খাতা না নিয়ে স্কুলে গেলে গার্জেন কল হবে। এই নিয়ে দু দিন নেহা ভুলে গেছে। নেহার ওপর স্কুলের টিচারদের খুব আশা। মেয়েটা ইচ্ছে করলেই স্ট্যান্ড করতে পারে। নেহার মাথায় জেদ চেপে গেল। টেবিলে বসে মন দিয়ে সেদিনের আর গত দুদিনের মোট তিরিশটা অঙ্ক রেফারেন্স বুক থেকে করে ফেলল। কয়েকটা

পারলনা। সেগুলো পরেরদিন বাবাকে জিগেস করে নেবে ঠিক করল। তখন বাজে রাত আড়াইটে। ঘুমে চোখ তার ঢুলে আসছিল। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙালেন মা।ভাগ্যি মা ছিল। আজ তাকে না ডেকে দিলে কি হত! স্কুল যাবার সময় মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে নেহা বলল "ও মা, তুমি আমার ওপর এখনো রাগ করে আছো?, আমি তো পড়াশোনা সব করে নিচ্ছি, দেখো এবার আমি আরো ভালো করব"
মা কোনো উত্তর দিলেন না।

ইউনিট টেষ্টের ফল বেরিয়েছে। একটাতেও নেহার মার্কস ভালো হয়নি এবার। টিচাররাও আপসেট। সেই সাথে নেহাও। বাড়ি ফিরে চুপচাপ খেয়েদেয়ে নিজের ঘরে ঢুকে নেহা ভাবল বই খুলে বসে যাবে। কিন্তু ডেস্কটপের আবেদন তাকে টেনে নিয়ে গেল মাউসের দিকে। হাত সুড়সুড় করে উঠল। জ্বলে উঠল নীল আলো। সমুদ্রের ঢেউয়ের ওয়ালপেপার। অন করল ওয়াইফাই মোডেম। ফেসবুকে পৌঁছেই সেই অবারিত বন্ধুত্বের হাতছানি। কি ভাল লাগছে নেহার সেই মূহুর্তে। সব জাগতিক দুঃখকেও ভুলে থাকা যায়। একে একে জ্বলে উঠেছে সকলের সবুজ আলোর বিন্দু। স্তুতি, তিথি, বন্দনা, শর্মিলা, আর সেই মহিলা যার সাথে আগের দিন রাতেও অনেক কথা হয়েছে, যার প্রোফাইল নাম "নিমপাতা"

নিমপাতা: হ্যালো নেহা! স্কুল থেকে ফিরলে?
নেহা : হ্যাঁ
নিমপাতা: কেমন মার্কস পেলে টেষ্টে?
নেহা : ভালো নয়।
নিমপাতা : কেন? তুমি তো ভালো মেয়ে, মা'কে কত ভালোবাস!
নেহা : কিন্তু মায়ের কথা তো শুনিনা আজকাল। তাই তো আমার এত খারাপ হয়েছে এবার
নিমপাতা : ঠিক আছে। এবার থেকে মা যা চায় তাই কোরো, তোমার ভালো হবে দেখো।
নেহা : আসলে আমি বুঝে উঠতে পারিনা কতক্ষণ সময় পড়ার টেবিলে দেব আর কতক্ষণ কম্পিউটারে। আর মা আমার টাইম ম্যানেজমেন্ট করে দিলেও রেগে যাই মায়ের ওপর।
নিমপাতা : ঠিক আছে এবার থেকে মায়ের সব কথা শুনে চলো, সব ঠিক ঠাক হয়ে যাবে।
নেহা : তুমি ঠিক বলছ তো নিমপাতা?
নিমপাতা : যাও গিয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে একটিবার বলো যে মা, আমি আগের মত লক্ষী হয়ে যাব, তোমার কথা শুনে চলব তাহলেই মা আর রাগ করবে না।
নেহা দৌড়ে পাশের ঘরে গিয়ে মা, মা করে ডাকতে গেল কিন্তু মাকে দেখতে পেল না। খুব মন খারাপ আজ তার। বারান্দায় গিয়ে দ্যাখে মা বসে আছে পেছন ফিরে...জড়িয়ে গলাটা ধরে আদর করতে গিয়ে দেখতে পেল মায়ের কোলে ছোট্ট নোটবুক কম্পিউটার আর যথারীতি মা তখনো "নিমপাতা" হয়ে ফেসবুকের সবুজ ঘরে আলো জ্বেলে রেখেছে তার আদরের নেহার কথা শুনবে বলে।

ইন্দিরা মুখার্জি
ভবানীপুর, কলকাতা

ছবিঃ
কৌস্তুভ রায়
কলকাতা

দ্রাঘিমাংশ

আমাদের বিন্দুবাসিনী বয়েজ স্কুলের ভূগোল স্যারের নাম পরমহংস পোদ্দার। তাঁর দুই যমজ ছেলে অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমাংশ আমাদের সহপাঠী। ক্লাসের ফার্স্ট বয় অক্ষাংশ একটু ধীর স্থির স্বভাবের। পড়াশোনায় তার খুব মন। খটমটে ইংরেজি গ্রামার হোক কিংবা কঠিনস্য কঠিন জিওমেট্রি, ভূগোলের কূটকাচালি হোক কিংবা ইতিহাসের সন-তারিখের আদ্যশ্রাদ্ধ, সবই অক্ষাংশের কাছে জলভাত। সাল্লের বার মাধ্যমিক দিতে চলেছি আমরা। অক্ষাংশের ওপর আমাদের স্কুলের তাই অনেক আশা।

ওদিকে দ্রাঘিমাংশর ধরনটা আবার একটু আলাদা। সারাদিন মাঠেঘাটে টো টো করে ঘুরে বেড়ায় সে। সেদিন একতা জ্যান্ত ঢোঁড়া সাপ কোত্থেকে নিয়ে এসে সোমনাথের স্কুলব্যাগে ঢুকিয়ে দিয়েছিল দ্রাঘিমাংশ। গতমাসে আবার অন্য ঘটনা। দুটো বিশাল সাইজের সোনাব্যাঙ ক্লাসের ভেতর ছেড়ে দিয়েছিল দ্রাঘিমাংশ। চিরকার চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছিল সব, সে এক হুলুস্থূল কান্ড! হেডস্যার টানা তিন পিরিয়ড নিল ডাউন করে রেখেছিলেন দ্রাঘিমাংশকে।

পরমহংস স্যারের আবার নাটকের দিকে ঝোঁক।পুরিয়ড অফ থাকলে টিচার্স কমনরুমে নাটকের বই পড়েন। আমরা যেমন গানের কলি গুনগুন করি, স্যার মেজাজ শরিফ থাকলে নাটকের ডায়ালগ বলেন একা একা।

সেদিন পরমহংস স্যার আমাদের পড়িয়ে ক্লাস থেকে বেরোচ্ছিলেন। সৌপায়ন বলল, নাটক প্রতিযোগিতার খবরটা শুনেছেন স্যার?

ভুরু কুঁচকে পরমহংস স্যার বললেন, কী খবর?

সৌপায়ন বলল, এবার কুশীলব নাট্যগোষ্ঠীর সুবর্ণ জয়ন্তী। তাই সব স্কুল গুলোর ধ্যে একটা রবীন্দ্রনাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে ওরাও। আমরা তাতে নাম দিতে চাই স্যার।

পরমহংস স্যার একটু বাঁকা হেসে বললেন, নাটক করবি? তা কী নাটক করতে চাস তোরা?

সৌপায়ন বলল, বাংলার স্যার বিজনবাবুর কাছে আমরা সেদিন রবি ঠাকুরের বিসর্জন নাটকের গল্পটা

শুনেছিলাম। ওটা করলে কেমন হয় স্যার?

পরমহংস স্যার তাচ্ছিল্যের একটা হাস হেসে বললেন, তোরা করবি অভিনয়? ও তোদের কম্ম নয়। ছাগল দিয়ে কি আর হালচাষ হয়!

সুমন বাংলায় প্রত্যেকবার হায়েস্ট মার্কস্ পায়, স্কুল ম্যাগাজিনে কবিতা-টবিতা লেখে। সুমন বলল, আপনি একটু শিখিয়ে পড়িয়ে দিলে আমরা আলবাত পারব।

পরমহংস স্যার বোধ হয় একটু খুশি হলেন। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, কিন্তু একটু অসুবিধে আছে। গুনবতী আর অপর্ণার পার্ট করার জন্য আমি মেয়ে কোথায় পাব?

লাস্ট বেঞ্চ থেকে দ্রাঘিমাংশ ফুট কাটল, সোমনাথ আর রাজেশ একদম মেয়েদের মত দেখতে। দুটোই স্নো পাউডার মেখে স্কুলে আসে। ওদের খুব ভাল মানাবে মেয়েদের রোলে।

হাসির ফুলঝুরি ছুটছে গোটা ক্লাসে।সোমনাথ আর রাজেশ দুজনেই খুব ফর্সা। লজ্জা পেয়ে গাল লাল হয়ে গিয়েছে দুজনের। সোমনাথ মিনমিন করে বলল, দ্রাঘিমাংশ বাজে কথা বলছে। আমরা মোটেই স্নো পাউডার মেখে স্কুলে আসিনা স্যার।

পরমহংস স্যার হাত তুলে থামিয়ে দিলেন তাকে। একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন সোমনাথ আর রাজেশের দিকে। ভুরু কুঁচকে বললেন, সত্যি সত্যিই ওই দুটো চরিত্রে তোদের দারুণ মানাবে!

গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল দুজন। পরমহংস স্যার সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, মেয়েদের পার্ট বলে মন খারাপের কিছু নেই। আগে যে গ্রামে গ্রামে পালাগান হত, তাতে ছেলেরাই তো শাড়ি টাড়ি পরে মঞ্চে উঠে সীতা বা দ্রৌপদী সাজত।

দ্রাঘিমাংশ একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, ইয়ে, মানে রঘুপতির রোলটা কে করবে?

পরমহংস স্যার বললেন, রঘুপতি সুমন করবে। অক্ষাংশ সাজবে রাজা গোবিন্দমাণিক্য। জয়সিংহের রোলে কাস্ট করা যেতে পারে কৌশিককে।

দ্রাঘিমাংশ হতাশ গলায় বললেন, আমি কোনও রোল পাব না?

পরমহংস স্যার দৃঢ় গলায় বললেন, না।

অন্যান্য চরিত্রগুলির হন্য সৌপায়ন, রনজয় আর অমিতদের মনোনীত করা হল। দ্রাঘিমাংশ কিছু বলল না। আমি ঢোঁক গিলে বললাম, আমাকে কোনও পার্ট দেবেন না স্যার?

পরমহংস স্যার বললেন, তুই প্রম্পট্ করবি। কেউ পার্ট ভুলে গেলে উইংসের ধার থেকে তুই ধরিয়ে দিবি, কেমন?

সুমন, অক্ষাংশ আর কৌশিকের দিকে তাকিয়ে পরমহংস স্যার বললেন, তোদের তিনজনের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে নাটকটা। বাকিরা তো দুধভাত। মনে রাখিস, তোরা ভাল না করতে পারলে পুরো নাটকটাই কিন্তু মার খেয়ে যাবে।

শুরু হয়ে গেল নাটকের রিহার্সাল। সবাই মিলে হাত লাগিয়ে বানিয়ে ফেলা হল নাটকের সেট। পোষাক

বানাতে দেওয়া হল বলিউড টেইলার্সে। পরমহংস স্যারের সঙ্গে গিয়ে ইলেক্ট্রিক আর মাইকের দোকানেও কথা বলে আসা হল এক সময়ে। স্কুলছুটির পর হলঘরে শুরু হল আমাদের মহড়া। রিহার্সালে দ্রাঘিমাংশ এসে চুপটি করে বসত আমার পাশে। মনোযোগ গিয়ে সব দেখত। মহড়া শেষ হলে গুটিগুটি ফিরে যেত বাড়ির দিকে।

এসে পড়ল আমাদের নাটক প্রতিযোগিতার দিন। পাঁচটার সময়ে আমাদের নাটক। ঠিক সময়ে রবীন্দ্র ভবনে এসে পড়লাম সবাই।শুধু নক্ষত্র রায়ের পার্ট যে করবে সেই রণজয়ের তখনও কোনও পাত্তা নেই। পরমহংস স্যার পায়চারি করছেন আর ঘড়ি দেখছেন বারবার। পাঁচ মিনিট যায়, দশ মিনিট যায়, রণজয়ের দেখা নেই।

চারটের সময়ে রণজয়ের কাকা স্কুটার চালিয়ে এলেন রবীন্দ্র ভবনে। আমরা সবাই ঘিরে ধরলাম তাঁকে। ভদ্রলোক বললেন, দাদার সকাল থেকেই বুকে ব্যথা করছিল। ডাক্তারের কথামত হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। ওঁর হার্টের অবস্থা ভাল নয়। রণজয় বাবার কাছে আছে, ওর পক্ষে আজ আর অভিনয় করা সম্ভব নয়।

পরমহংস স্যার শুকনো গলায় বললেন, সর্বনাশ! নক্ষত্র রায়ের পার্ট কে করবে এখন?

সবাই চুপ। পরমহংস স্যার এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন যেভাবে বানভাসি মানুষ আঁকড়ে ধরার জন্য খড়কুটো খোঁজে। হটাত করে আমার দিকে তাকিয়ে বড় বড় চোখ করে বললেন, তুই তো এতদিন প্রম্পটিং করেছিস। তুই পারবি না চালিয়ে দিতে?

আমি থতমত খেয়ে বললাম, আমার সকাল থেকেই কেমন গা গুলোচ্ছে, আমি পারব না স্যার।

দ্রাঘিমাংশ পাশ থেকে বলল, আমি পারব।

পরমহংস স্যার বিস্মিত হয়ে বললেন, পাগল নাকি? পার্ট মুখস্থ না হলে কেমন করে ম্যানেজ করবি তুই?

দ্রাঘিমাংশ বলল, শুধু নক্ষত্র রায় কেন, একমাস ধরে মহড়ায় শুনে শুনে প্রত্যেকটা চরিত্রের পার্ট আমার আগাগোড়া মুখস্থ। শুনিয়ে দেব?

পরমহংস স্যার অসহায়ের মত ঠোঁট কামড়ালেন। তারপর দ্রাঘিমাংশর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, যা, তুই গ্রিনরুমে গিয়ে মেক আপ করে নে। তারপর যা আছে কপালে।

শুরু হল আমাদের নাটক। রঘুপতির ভূমিকায় দারুণ অভিনয় করল সুমন। গোবিন্দমাণিক্য আর জয়সিংহের চরিত্রে প্রচুর হাততালি পেল অক্ষাংশ আর কৌশিক। এমনকী গুণবতী আর অপর্ণার রোলেও দিব্যি মানিয়ে গেল রাজেশ আর সোমনাথকে। কিন্তু সবাইকে অবাক করে নক্ষত্র রায়ের রোলে জমিয়ে দিল দ্রাঘিমাংশ। মনেই হল না একটুক্ষণ আগেই সে জানতে পেরেছে যে তাকে নক্ষত্র রায় সাজতে হবে। রঘুপতির প্ররোচনায় সিংহাসনে বসার লোভ কখনও চকচক করছে নক্ষত্র রায়ের চোখে। ওদিকে আবার দাদা গোবিন্দমাণিক্যর সামনে জড়োসড়ো হয়ে যাচ্ছে নক্ষত্রর ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব। দ্রাঘিমাংশ এত সুন্দর তার চরিত্রটা ফুটিয়ে তুলল যে জাজ্‌রা পর্যন্ত হাততালি দিয়ে উঠলেন সামনের সারি থেকে।

নাটক প্রতিযোগিতায় প্রায় সব প্রাইজ জিতে নিল আমাদের বিন্দুবাসিনী বয়েজ। সেরা নির্দেশকের প্রাইজ পেলেন পরমহংস স্যার। সুমন পেল শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরষ্কার। নক্ষত্র রায়ের চরিত্রকে প্রাণদান করার জন্য দ্রাঘিমাংশ পেল বিশেষ পুরষ্কার। কুশীলবের প্রেসিডেন্ট গ্রিনরুমে এসে দেখা করে গেলেন দ্রাঘিমাংশর সাথে। বললেন, তোমার ভেতরে নাটক আছে, তুমি অনেকদূর যাবে।

গ্রিনরুমে মেক আপ তুলছে নাটকের অভিনেতারা। আমরা সাহায্য করছি তাদের। পরমহংস স্যার কখন যেন এসে দাঁড়িয়েছেন আমাদের মধ্যে। বড় একটা শ্বাস ফেলে পরমহংস স্যার বললেন, বেশ কয়েকবছর আগে কুশীলবের রিহার্সালে গিয়েছিলাম আমি। আমার ধারণা ছিল যে মূল চরিত্রে অভিনয় না করতে পারলে অভিনয় করাই বৃথা।

আমরা তাকিয়ে আছি তাঁর দিকে। পরমহংস স্যার বললেন, আজ বুড়ো বয়সে আমার ছেলের কাছ থেকে এক বিরাট শিক্ষা পেলাম আমি।আসলে ছোট পার্ট বড় পার্ট বলে কিছু হয় না। ভাল অভিনয়টাই আসল, অন্য কিছু নয়। প্রত্যেক অভিনেতা সমান তালে অভিনয় না করলে কখনওই একটা সার্থক নাটক সৃষ্টি হয় না। শুধু তাই নয়, মঞ্চের বাইরে থেকে যারা রূপসজ্জা করে, আলোর কাজ করে, প্রপস্ সাজায় কিংবা শব্দ সংযোজনা করে তারা প্রত্যেকেই একটা বড় চাকার ছোট ছোট নাট বল্টুর মত গুরুত্বপূর্ন অংশ।

সবার চোখ চকচক করছে খুশিতে। সবাই আলিঙ্গন করছে দ্রাঘিমাংশকে। শেষে আমার টার্ন এল। আমি ওকে জড়িয়ে ধরতেই আমার কানের কাছে মুখটা এনে দ্রাঘিমাংশ বলল, তুই অত দাঁত ক্যালাচ্ছিস কেন, সবার ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। প্রম্পটারের কথা কিন্তু কিছু বলা হয়নি!

আমি হাঁ করে তাকালাম ওর দিকে। আমার পিঠে একটা চাপড় মেরে হো হো করে হেসে ফেলল দ্রাঘিমাংশ।

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য
জলপাইগুড়ি

ছবিঃ
কৌস্তুভ রায়
কলকাতা

ক্র্যাশ-কোর্স

- এই রাগ্নিক, তোর লাল রঙের পেন্সিলটা আমায় একবার দিবি?
- কি? কি বলে আমায় ডাকলি?
- তোর নাম তো রাগ্নিক।
- আর একবার যদি আমায় এই নামে ডাকিস তো এই পেন্সিলটা তোর দু আঙ্গুলের মাঝে রেখে এমন চাপ দেবো যে দুটো আঙ্গুলই মটমট করে ভেঙ্গে দু'টুকরো হয়ে যাবে।
- কিন্তু ওরা যে বলল!!

মুখ চুপসে যায় ছেলেটার। আজই স্কুলে প্রথম এসেছে। আর বাকি ছেলেরা কায়দা করে ঠিক তার পাশেই বসতে দিয়েছে। যত্তসব উদবিড়ালের দল। রাগে রিরি করে মাথাটা। হ্যাঁ, ঠিকই অন্য ছেলেদের থেকে সাগ্নিকের একটু বেশিই রাগ হয়ে যায়। তা বলে 'রাগ্নিক' বলে ডাকবে? এমনকি এই নতুন ছেলেটাকে পর্যন্ত প্রথম দিনে সেটা শিখিয়েও দিয়েছে!!

ক্লাস শেষের ঘন্টা পড়তে সবার আগে বেরিয়ে আসে সাগ্নিক। ব্যাগ নিয়ে দে দৌড়। মঞ্জুকাকার জামাকাপড়ের দোকান, অসিতজেঠুর মিষ্টির দোকান পেরিয়ে বাঁই বাঁই করে দৌড়তে থাকে। বাঁদিকের গলি শেষ হয়েছে যে বড় রাস্তাটায় সেটা পেরিয়ে বাঁদিকে আরো কিছুটা গেলে নবারুন পার্ক। পার্কের কোন ঘেঁষে ওদের বাড়ি।

কাঁই কাঁই আওয়াজ শুনে তাকিয়ে দেখে গলির মোড়ে একটা ছোট্ট কুকুর তিন পায়ে লেংচে লেংচে ছুটছে আর ওরই সমবয়সী কতকগুলো দুষ্টু ছেলে লাঠি নিয়ে তাকে তাড়া করেছে। কুকুর বলে কি তার কষ্ট হয়না!! গাছের একটা শুকনো ডাল ভেঙ্গে নিয়ে তেড়ে যায়।

- ওকে মারছিস কেন রে? দেখছিস না ওর পায়ে কত লেগেছে। আমি যদি এই লাঠি দিয়ে তোদেরকে

এক ঘা দিই তো কেমন লাগবে?

ছেলেগুলো ঘাবড়ে গিয়ে ছুটে পালায়। কুকুরটা দূরে দাঁড়িয়ে করুণ চোখে তাকিয়েছিল ওর দিকে। দেখেই এমন মায়া পড়ে গেল! একটা নামও দিয়ে ফেলল ততক্ষনাৎ -'ফুটকি'। ফুটকিকে কোলে করে বাড়িতে নিয়ে যাবে। ওষুধ দিয়ে ব্যান্ডেজ করে রাখলে কদিনেই সেরে যাবে ওর পা। কিন্তু ফুটকিকে ধরতে যেতেই সে ছুটে পালালো। পেছন পেছন দৌড়ল ও। দৌড়তে দৌড়তে এসে পৌঁছলো একটা উঁচু বাঁধের কাছে। ফুটকি সেই বাঁধে উঠে ম্যাজিকের মত উবে গেল। সাগ্নিকের তখন হুঁশ ফিরলো। চারিদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো সে রাস্তা হারিয়েছে। ফুটকিকে কেন যে ধরতে গেল!! সব রাগ গিয়ে পড়ল ঐ বজ্জাত ফুটকিটার ওপর।

হতাশ হয়ে বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। সামনে চোখে পড়ল একটা বিশাল পুকুর। তার চারিদিকে ঘনগাছপালা ভর্তি বাগান প্রায় জঙ্গলের আকার নিয়েছে। এই গ্রীষ্মের দুপুরেও বেশ মনোরম একটা হাওয়া দিচ্ছে। একটানা অনেকক্ষণ ছুটে ক্লান্তও লাগছিল খুব। পুকুরের ধারে ছায়ায় গিয়ে বসে। বসে বসে ঢিল ছোঁড়ে। দেখে জলের ঢেউগুলো কেমনভাবে সরে যাচ্ছে দূরে, আরো দূরে। পুকুরপাড়ের গাছগুলোর সবুজাভ কালো ছায়া জলের ঢেউ-এ এঁকেবেঁকে যাচ্ছে ক্রমাগত। শুকনো পাতারা গাছ থেকে ঝরে পড়ছে টুপটাপ আর নৌকোর মতো ভেসে চলেছে নিরুদ্দেশে। মনটা বেশ ফুরফুরে লাগে।
হঠাৎ ওর ঢিলের পাশে আর একটা বড় ঢিল এসে পড়ে। আর তার জোরদার ঢেউয়ে ওর দুর্বল ঢেউটা ভেঙ্গেচুরে যায়। ও চেঁচিয়ে ওঠে, কে রে ঢিল ছুঁড়ছিস?

গম্ভীর গলায় উত্তর আসে, এমন সামান্য ব্যাপার নিয়ে চেঁচামিচি করছিস কেন?

তাকিয়ে দেখে পুকুরের জলের ওপর নুয়ে পড়া শিরিষগাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে আছে এক অদ্ভূত দেখতে মানুষ। মিশমিশে কালো তার গায়ের রঙ, লিকলিকে সরু হাত-পা, লাললাল চোখ, চকচকে টাক মাথা, পরনে সাদা ধবধবে হাফ শার্ট আর হাফ প্যান্ট আর পিঠে একটা ইয়া বড় স্কুলের ব্যাগ।
- তুমি ঢিল ছুঁড়ে আমার ঢেউ নষ্ট করছো কেন?
- আহা, ঢেউ কি আর তোমার আমার হয় নাকি ঢেউকে কেনা যায়?
- কিন্তু ঢেউ তো তৈরী করা যায়?
- ঢেউ তৈরী করে রাগও কমানো যায়। আবার ঢেউ দিয়ে ঢেউ ভাঙ্গাও যায়।
- রাগ কমানো যায়?
- হ্যাঁ, যায় তো। ঢিল ছুঁড়লেই রাগ ভাল হয়ে যায়। তাই রাগ হলেই আমি এই আমলকী বাগানে চলে আসি।
- কতো রকমের ঢিল ছোঁড়া যায় জান? আমি এমন ভাবে ঢিল ছুঁড়তে পারি যে সেটা ব্যাঙের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে যাবে।
খুব অবাক হয়ে তাকালো লোকটা। সাগ্নিক একটা পাতলা টালির টুকরো জোগাড় করে জলের প্রায় সমান্তরালে ছুঁড়ে দিল। সেটা তিন বার লাফিয়ে ডুবে গেল জলে। লোকটা তাই দেখে বলল,
- কয়েকবার চেষ্টা করলে আমিও পারবো এটা। কিন্তু আমি এমন অনেক কিছু পারি যা তুই ইচ্ছে করলেও পারবি না।
- কেমন?
- যেমন ধর, আমি এক সেকেন্ডের মধ্যে পুকুরের ওপারের গাছ থেকে একটা কয়েতবেল পেড়ে এনে দিতে পারি।

- ধুত, তুমি কি আর সুপারম্যান নাকি!!
- বিশ্বাস করছিস না!! তবে এই দ্যাখ।
বলেই লোকটা ডান হাতটা বিশাল লম্বা করে বাড়িয়ে দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে একটা পাকা কয়েত বেল পেড় এনে দিল। মুখ হাঁ হয়ে গেছে সাগ্নিকের – আর কি কি পারো তুমি? ভ্যানিশ হতে পারো?
লোকটা সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে আবার সশরীরে দেখা দিল।
- তুমি কি ম্যাজিসিয়ান?
খুব তাচ্ছিল্যের সুরে সে বলল - নাহ, আমি হলাম ভজহরি। তবে তুই আমায় ভজহরিদা বলে ডাকবি। আমি বয়েসে তোর থেকে পাক্কা চার শতাব্দী বড়।
- শতাব্দী মানে?
- শতাব্দী মানে একশ বছর।
- তোমরা শতাব্দীতে বয়স হিসেব কর কেন?
- তোদের মানুষদের একরকম নিয়ম আর আমাদের ভূতেদের আর একরকম। যাদের যেমন সুবিধে।
- ওহো তাই বলো। তুমি হলে ভূত। ভূতেরা হাত লম্বা করে বাগান থেকে লেবু তুলে আনতে পারে এসব আমি গল্পের বই-এ অনেক পড়েছি। কিন্তু ভূত বলে আসলে তো কিছু নেই।
- ওসব যারা কোনদিন ভূত দেখেনি তারা বলে। কিন্তু তুই তো আমায় নিজের চোখে দেখলি। যাকগে তোর সঙ্গে আমার এত বকবক করার সময় নেই এখন। একটা জরুরী কাজ সারতে হবে।
বলেই ভজহরিদা পিঠের ব্যাগ খুলে একটা ল্যাপটপ কম্পিউটার বার করে ফেলল। তাতে চার হাত পায়ের কুড়িটা আঙ্গুল দিয়ে প্রচন্ড গতিতে লিখতে শুরু করল। এমন ইন্টারেস্টিং মানুষ থুড়ি ভূত সাগ্নিক কোনদিন দেখে নি। ও ভজহরিদার প্রায় গা ঘেঁষে বসে কার্যকলাপ দেখতে থাকল।
- কী লিখছো ভজহরিদা?
- সারাদিনের যা করেছি সব রিপোর্ট লিখে স্কুলের হেডস্যারকে পাঠাতে হবে।
সাগ্নিকের ছবি, কথাবার্তাও রেকর্ড করে ভিডিওটা লেখার মধ্যে জুড়ে দিল। তারপর লেখাটা ইমেল করে পাঠিয়ে দিল।
- তুমি এই বাগানের মধ্যে বসে ইন্টারনেট পাচ্ছ কি করে ভজহরিদা?
- আঃ!! ইন্টারনেট নয়, এসব হল ঘোস্টনেট। ইন্টারনেটের থেকে অনেক বেশী উন্নত।
- এই কম্পিউটারে ভিডিও গেমস খেলা যায়?
- যাবে না আবার! আমাদের স্কুলে সব পড়াশোনা তো ঐ সব গেমস দিয়েই শেখানো হয়।
- কী ভালো স্কুল তোমার!! আমার বাড়ির কম্পিটারে তুমি একটা নতুন গেম ইন্সটল করে দেবে?
- আমাদের ঘোষ্টওয়্যার তোদের মেশিনে চলবে না। কোন আদ্যিকালের কম্পিউটার ব্যবহার করিস তোরা। সফটওয়্যার আর হার্ডওয়্যার ছাড়া আর কিছুই শিখে উঠতে পারল না মানুষ। যাকগে, তোর সঙ্গে আলাপ হয়ে খুব ভালো লাগল। আমি এখন স্কুলে যাই। আমার টিফিন ব্রেক শেষ।
বলেই ভজহরিদা তার কম্পিউটার পিঠের ব্যাগে পুরে দিল। খুব মন খারাপ হয়ে গেল সাগ্নিকের। ভেবেছিল ভজহরিদাকে জপিয়ে তার ল্যাপটপে একটু গেমস খেলে নেবে।
- আবার তোমার সঙ্গে কবে দেখা হবে ভজহরিদা?
- মাঝে মাঝে আমি এখানে আসি। তুই এলে দেখা হয়ে যাবে কোন দিন।
বলেই ভজহরিদা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। লোকজনকে জিজ্ঞেস করে রাস্তা খুঁজে নিয়ে হতাশ মনে বাড়ি ফিরল সাগ্নিক।

রোজ সকালে ঘুম থেকে ওঠা নিয়ে মা বাবার সঙ্গে এক প্রস্থ চেঁচামিচি হয় সাগ্নিকের। সকালবেলা এত ঘুম পায়। তার ওপর মা একবার ডাকার পরেই ভয়ানক তাড়া লাগাতে থাকে। একটা হুংকার দিয়ে মাকে চুপ করায় তো শুরু হয়ে যায় বাবার বাজখাঁই গলায় হাঁকডাক। আজও সকালে ঘুম থেকে ওঠা নিয়ে যুদ্ধ লেগে যাচ্ছিল প্রায়। কিন্তু হঠাৎ ভজহরিদার কথা মনে পড়ে গেল সাগ্নিকের। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে দিল ছুট। বাড়ির পেছনের ছোট পুকুরটার সান বাঁধানো ঘাটে বসে বসে বেশ কয়েকটা ঢিল ছোঁড়ে। জলের ঢেউগুলোর দিকে আনমনে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনুভব করে ম্যাজিকের মতো কখন যেন সত্যিই ওর রাগটা গায়েব হয়ে গেছে আর এই সুন্দর সকালটার মতো ঝকঝকে আলোময় হয়ে উঠেছে মনটা। নতুন শেখা রাগ কমানোর ম্যাজিকটা ওকে টগবগে আর উত্তেজিত রাখে বেশ কয়েকদিন।

একদিন স্কুলে পৌঁছতে দেরি হওয়ায় হেডস্যার খুব বকলেন। মেজাজ গুম হয়ে রইল। তারপর টিফিন টাইমে খাবে বলে সবে টিফিন বাক্সটা খুলেছে এমন সময় পলাশ এমন ধাক্কা দিলো যে সব খাবার পড়ে গেল মাটিতে। ও পলাশের চুলের মুটি ধরে দিল এক চাপ্পড়। পলাশ গিয়ে স্যারকে বলে দিল। স্যার এসে ওকে কান ধরে দাঁড় করিয়ে দিল বেঞ্চের ওপর। মাথা গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল সারা টিফিন। রাগে দুঃখে চোখে জল এসে যাচ্ছিল।

স্কুল থেকে ফেরার পথে পড়ে রন্টুদার সাইকেল সারানোর দোকান। রন্টুদা ওকে দেখেই ডাক দেয়,
– সাইকেল চড়বি নাকি?
সাইকেলের কথা শুনে গুটিগুটি পায়ে রন্টুদার দোকানে এসে ঢোকে। একটা সাইকেল এগিয়ে দিয়ে রন্টুদা বলে,
– এই সাইকেলটা আজই সারিয়েছি। যা, একটা টেস্ট ড্রাইভ দিয়ে আয়।
সাইকেল উঠে জোরে পা চালায়। পৌঁছে যায় সেই আমলকী বাগানে। রাগ কমানোর জন্যে পুকুরপাড়ে বসে ঢিল ছুঁড়তে শুরু করে। কিন্তু কোন লাভ হয়না। বাড়ি ফিরে যাবে ভাবতে না ভাবতে ভজহরিদা হাজির।
– আজ খোকাবাবুর মন ভালো নেই কেন?
– এতগুলো ঢিল ছুঁড়লাম তাও আমার রাগ ভালো হল না।
– রাগ হল কেন?
– রাগ হবে না!! পলাশ ধাক্কা মেরে আমার সব টিফিন ফেলে দিল তার বেলা কিছু না। অথচ আমি ওকে এক ঘা মেরেছি বলে স্যার আমাকে সারা টিফিন ব্রেকে কান ধরে দাঁড় করিয়ে রাখল।
– বুঝেছি। এটা ঢিল রাগ নয়, মিল রাগ। পেট ভরে খাবার মিললেই ভালো হয়ে যাবে।
ভজহরিদা মুহূর্তের মধ্যে কোথা থেকে অনেকগুলো আম নিয়ে হাজির। বলল,
– আমগুলো পুকুরের জলে ধুয়ে হাত দিয়ে সারা গা চটকে নরম করে ফেল। তারপর ডগার দিকে দাঁত দিয়ে কেটে একটা ফুটো করে মুখ লাগিয়ে খা।
ভজহরিদার কথা মত ও আমটা ধুয়ে, চটকে, ডগায় একটা ফুটো করে মুখ লাগিয়ে টান দেয়।
– আঃ!! কি দারুন খেতে ভজাদা। একেবারে আসল ফ্রুট জুস।
– রাগ কমল এইবার?
– একদম ভ্যানিশ। আচ্ছা, তুমি রাগ নিয়ে এতো কিছু জানো কি করে?
– জানতেই হয়। আমাদের স্কুলে রাগ নিয়ে অনেক লেখাপড়া করতে হয়। রাগ কন্ট্রোল করতে না পারাটা ভূতকূলের এক বড় সমস্যা।

- কি রকম?
- ভূতেরা ইচ্ছে মতন অদৃশ্য বা সশরীরী হতে পারে। কিন্তু রাগ হলে এই ক্ষমতা লোপ পেয়ে যায়। তখন ভূতেরা ইচ্ছে করলেও আর অদৃশ্য হতে পারেনা। ফলে আশেপাশে কোন মানুষ থাকলে তারা ভূতদের দেখে ফেলে আর অজ্ঞান হয়ে যায়। আমাদের জন্যে এটা খুব নিন্দনীয় ব্যাপার।
- তোমরা এসব নিয়ে এতো ভাবো?
- এই নিয়ে রীতিমত রিসার্চ হয়। রিসার্চে দেখা গেছে যে ভূতেরা যদি দশ সেকেন্ডের কম দেখা দেয় তাহলে মানুষরা একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেও অজ্ঞান হয়না। চোখ বন্ধ করে চোখ কচলে আবার যখন তাকায় ততক্ষনে ভূত ভ্যানিস। কিন্তু দশ সেকেন্ডের বেশি থাকলে সাধারনতঃ মানুষরা অজ্ঞান হয়ে যায়। এমনকী হার্ট ফেল করে মারাও যেতে পারে। একমাত্র পাগলরা মিনিট পাঁচেক দেখেও অজ্ঞান হয় না।
- কি ভাবে রাগ কমানো শেখায় তোমাদের?
- রাগ কমানো নয় রাগ কন্ট্রোল করা শেখায়। অনেক বই পড়তে হয়। প্রাক্টিস করার জন্যে অনেক ভিডিও গেমস খেলতে দেয়। পরীক্ষাও নেওয়া হয় ভিডিও গেমস খেলেই।
- কিরকম খেলা সেগুলো?
- খেলায় অনেক লেভেল আছে। প্রত্যেক লেভেলে নানারকম ঘটনা ঘটিয়ে আমাদের রাগিয়ে দেওয়া হয়। রেগে গেলে মানুষের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মেপে দেখা হয় কে কত তাড়াতাড়ি রাগ কন্ট্রোল করে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। এরকম একশোটা লেভেলে পেরোতে পারলে তবেই পাস।
- আমারও খুব রাগ হয়ে যায় জানো। রাগ হলে আমি অনেক ভুল কাজ করে ফেলি। এমনকি পড়াও মনে করতে পারিনা। স্কুলে সব বন্ধুরা আমার পেছনে লাগে।
- রাগ তো সবারই কম বেশী হয়। কিন্তু রাগকে কন্ট্রোল করতে পারলেই কেল্লা ফতে। রাগ হবে তোর পোষা কুকুরের মতো।
- মানে?
- ধর তোর একটা কুকুর আছে। তার গলায় একটা চেন বাঁধা। চেনটা তুই শক্ত করে ধরে আছিস। এখন কুকুর যেদিকে যাবে তুই কি সেদিকেই যাবি নাকি তুই যেদিকে যেতে চাইবি কুকুরটাকে সেদিকেই নিয়ে যাবি?
- আমি যেদিকে যেতে চাইবো সেদিকেই কুকুরটাকে নিয়ে যাবো।
- হ্যাঁ ঠিক সেরকম। তোকে তোর রাগকে পোষা কুকুরের মতো কন্ট্রোলে রাখতে হবে। তুই যদি চাস তো আমি তোকে দুদিনের একটা ক্র্যাশ কোর্স করিয়ে দিতে পারি।

সাগ্নিক এককথায় রাজি।

দুদিন সারাদিন অদৃশ্য হয়ে সাগ্নিকের সঙ্গে সঙ্গে থাকল ভজহরিদা। রাগ নিয়ে অনেক কিছু শিখিয়ে দিল ওকে। রাগ নানারকমের হয় যেমন ঢিল রাগ, মিল রাগ, ফিল রাগ, কিল রাগ, চিল রাগ ইত্যাদি। কোন রাগ কিভাবে শনাক্ত করবে এবং কিভাবে তা কন্ট্রোল করবে সে সম্বন্ধে একটা হাল্কা ধারণাও দিয়ে দিল।

প্রথমদিন মা সকালে ঘুম থেকে ডাকতেই রেগে গিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল ও। অমনি অদৃশ্য ভজহরিদা ফিসফিসিয়ে বলল, খিল রাগ, খিল রাগ।
- মানে?

- এটা রাগ কন্ট্রোল করার প্রথম পাঠ। ঘুম বা খিদে পেলে বা ক্লান্ত হয়ে গেলে সবারই কম বেশি রাগ হয়ে যায়। রাগ হয়েছে বুঝতে পারলেই মুখে খিল দেবে। মুখ বন্ধ রেখে ভাববে। ভাববে তুমি যা চাইছ সেটা হলে কি ভালো হবে? ধরো, তুমি ঘুম থেকে উঠতে চাইছো না। না উঠলে স্কুলে যেতে পারবে না। তুমি তাই চাও?

একটু ভেবে সাগ্নিক বলল, স্কুলে না গেলে, পড়াশোনা না করলে আমি বড় হব কি করে?
- তাহলে লক্ষী ছেলের মতো কথা না বাড়িয়ে উঠে পড়ো।
স্কুলে ফুটবল খেলতে গিয়ে মন্মথ-র সঙ্গে মারামারি হয়ে যাচ্ছিল প্রায়। ও ঠিক করে পাসটা বাড়াতে পারেনি বলে মন্মথ মুখ ভেঙ্গিয়ে বলল,
- দুধ সাবু খেয়ে রাজপুত্র নেমেছেন খেলতে। বলে শট মারছে না তো যেন ফুঁ দিচ্ছে।
আর একটু হলে সত্যি এক ঘা বসিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু ভজহরিদা বলল,
- ফিল রাগ। ফিল রাগ। মুখে খিল দিয়ে ফিল করো। অনুভব করো। এটা দ্বিতীয় পাঠ। ওর

জায়গায় তুমি থাকলে কি করতে? এই সব নিরীহ কথা একদম গায়ে মেখো না। চেষ্টা করো আরো ভালো খেলতে। চেষ্টা করো নিজেকে নিয়ে একই রকম মজা করতে।
ব্যাপারটা বুঝতে সময় লেগেছিল ওর। হাফ টাইমে অনেকক্ষন ধরে ভজহরিদা ওকে বোঝালো। তারপরে কেমন একটা মনের জোর এসে গেলো। সেকেন্ড হাফে খেলতে নেমে মন্মথকে বলল,
- রাজপুত্র এইবার মাংস আর লুচি খেয়ে খেলতে নেমেছে।
সেদিন ওদের ব্লু হাউস টিম পাঁচটা গোল করেছিল গ্রীন হাউসকে। তার তিনিটে গোলই দিয়েছিল ও। ওকে নিয়ে কী আনন্দই না করেছিল সবাই। সেদিনের জেতার সব ক্রেডিট ছিল ভজহরিদার।
পরের দিন স্কুল ছুটি। সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা। বৃষ্টি হচ্ছিল ঝিরঝির করে। বাইরে খেলতে যাওয়ার কোন উপায় ছিল না। ভিডিও গেমস খেলার একেবারে আদর্শ দিন। কিন্তু মা কম্পিউটার ছুঁতে দিলনা। ভজহরিদার কথা মতো মায়ের সঙ্গে তর্ক না করে মুখে খিল দিয়ে রইল ও। কিন্তু রাগটা গজগজ করছিল মাথায়। কিছুই ভালো লাগছিল না। চিলেকোঠার ঘরে একা বসে বসে বৃষ্টি দেখছিল আর মন খারাপ করছিল। গাছের ডালে বসা শালিখটার মতো যদি ভিজতে পারতো!! কিন্তু কিছুই হওয়ার নয়।

ভজহরিদা আসতেই অভিযোগ করল, মা আমায় ভিডিও গেমস খেলতে দিচ্ছে না।
- খুব ভাল করেছে। ঘরে বসে খেলার থেকে মাঠে ঘাটে ছোটাছুটি করলে শরীর মন ভালো থাকবে।
- কিন্তু এত বৃষ্টিতে বাইরে বাইরে খেলা যায়?
- ঢিল রাগ, ঢিল রাগ। তৃতীয় পাঠ এটা। যখন বিশেষ কোন কারন খুঁজে পাওয়া যাবে না অথচ কিছুতেই মনটা ভালো লাগবে না তখন ঢিল ছুঁড়বি।
- এই বৃষ্টিতে কোথায় ঢিল ছুঁড়ব?
- ঢিল মানে কি সবসময় ঢিল নাকি? নিজের ঘরে যা। একটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে অন্য দেওয়ালে বল ছোঁড়। তারপর দেখ রাগ কমে কিনা।
বল ছোঁড়া শুরু করার একটু পরেই ওর মাথায় অনেক প্ল্যান আসতে শুরু করে।
- ভজহরিদা, তুমি লুডো খেলতে জানো?
পরের এক ঘন্টা লুডো খেলে কোথা দিয়ে যে সময় কেটে গেল! ও এখন অনেকটাই শিখে গেছে কি ভাবে রাগ কন্ট্রোল করতে হয়। ভজহরিদা বলেছে, মাথার সঙ্গে খাতা, পাতা আর ছাতার গভীর সম্পর্ক। কোন উপায়েই রাগ কন্ট্রোল করতে না পারলে রাগের কথা ডায়েরীতে লিখে ফেলতে। তাতে রাগগুলো মাথা থেকে খাতায় চলে যবে। একান্তই লিখতে ইচ্ছে না করলে গাছের কাছে গিয়ে পাতা ছুঁইয়ে ফিসফিসিয়ে বলে দিতে পারে সব। নিমেষে রাগগুলো মাথা থেকে গাছের পাতায় চলে যাবে। বৃষ্টির দিনে ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারে রাস্তায়। শুনতে পারে বৃষ্টির টাপুর টুপুর শব্দ। বৃষ্টির জলে ছাতার সঙ্গে মাথার রাগও সব ধুয়ে মুছে যাবে।

দ্বিতীয় দিনেই ভজহরিদা ঘোষণা করল যে, রাগ ম্যানেজমেন্টের ক্র্যাশ কোর্স শেষ। এখন থেকে ওকে নিজে নিজে রোজ বাড়িতে, স্কুলে, খেলার মাঠে সবসময়ই যা শিখেছে তা অভ্যাস করতে হবে। ও যেহেতু বুদ্ধিমান তাই রাগ কন্ট্রোল করতে ওর কোন অসুবিধে হবে না।

মাঝে মাঝে স্কুল থেকে ফেরার সময় সাগ্নিক রন্টুদার দোকানে ঢুঁ মারে। সাইকেল জোগাড় হলে চলে আসে আমলকী বাগানে। ভজহরিদার দেখা মিললে একটু গল্প গুজব হয়। একদিন দেখে, জলে টুপ টাপ একের পর এক ঢিল পড়ছে।

- কি ব্যাপার আমাকে দেখেও দেখা দিচ্ছ না যে।

অদৃশ্য ভজহরিদা সশরীরে দেখা দিল। মুখটা ম্রিয়মান। দুঃখী গলায় বলল,
- আমি পরীক্ষায় ফেল করেছি।
- তাতে কি হয়েছে? পরের বছর ভালো করে পড়ে আবার পরীক্ষা দেবে।

সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল সাগ্নিক।

- ভূতসমাজে ফেল করলে শাস্তি দেওয়া হয়।
- এমন নিমপাতা মার্কা যাচ্ছেতাই নিয়ম কে বানিয়েছে?
- আমাদের মাননীয় সরকার।
- তোমাদেরও সরকার আছে?
- থাকবে না? এত বড় দেশ। রীতিমত ভূততান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার নির্বাচন করা হয়।
- শাস্তিটা কি?
- খুব অপমানজনক শাস্তি!! যারা পরীক্ষায় ফেল করে তাদেরকে এক ডোজ করে ভূতজোলাকিয়া খাওয়ানো হয়। তাতে সেই ভূত পরবর্তী এক শতাব্দীর জন্যে ভূতঘুমে চলে যায়।
- একশো বছর ধরে ঘুমাবে? কি অদ্ভুত শাস্তি!!
- হ্যাঁ। ফলে একশো বছরের জন্যে সরকার নিশ্চিন্ত। তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে না। তাদের রাগ নিয়েও ভূত বা মনুষ্য সমাজে কোন সমস্যা তৈরী হবে না।
- কিন্তু তুমি আমাকে এতো ভালো রাগ কন্ট্রোল করা শিখিয়েছ। তুমি ফেল করলে কেন?
- ঐ যে সেদিন তোর সঙ্গে সশরীরে অনেকক্ষণ কথা বলেছিলাম। ওরা ভেবেছে আমি আমার রাগ কন্ট্রোল করতে পারিনি। আসলে সেদিন তুই আমাকে দেখে একটুও ভয় পাসনি, বন্ধুর মতো কত গল্প করলি। তাই আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে তুই মানুষ আর তোর কাছে আমার অদৃশ্য থাকা উচিত।
- বুঝেছি। তুমি আমাকে তোমাদের হেডস্যারের কাছে নিয়ে চলো। আমি বুঝিয়ে বললে তিনি নিশ্চয় বুঝবেন।

ঝটিকা সফর। ওরা এসে পৌঁছলো এক শুনশান জায়গায়। এক দিকে ঘন বাঁশবন। বাঁশের গায়ে বাঁশ লেগে থেকে থেকে কটাকট্‌ট্‌টকরে আওয়াজ হচ্ছে। অন্যদিকে দিগন্ত বিস্তৃত ফাঁকা মাঠ। আকাশে সরু একফালি চাঁদ। কেউ কোথাও নেই। এমনকী কোন ব্যাং বা ঝিঁঝিঁর ডাক পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। ভজহরিদা ফিসফিসিয়ে কি সব কথা বলল। তারপর আস্তে আস্তে চারপাশে দৃশ্যমান হতে থাকল আর এক দুনিয়া।

ঘরের মধ্যে ওরা দাঁড়িয়ে। চারিদিকে চেয়ার টেবিল, কম্পিউটার। অসংখ্য ভূত কাজ করছে। কেউ কেউ ব্যাস্ত হয়ে এদিক ওদিক যাতায়াত করছে। একটা বিশাল ভুঁড়িওয়ালা ভূত ভজহরিদার সঙ্গে কী সব আলোচনা করল। তারপর ওকে ধরে ঢুকিয়ে দিল একটা ছোট্ট কাঁচের ঘরে। সেখানে অনেক যন্ত্রপাতি। লাল নীল সবুজ রঙের আলো জ্বলছে। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে সাগ্নিক জিগ্যেস করল,

- আমাকে এই ঘরে পুরে দেওয়া হল কেন জানতে পারি?

ভুঁড়িওয়ালা ভূত বলল, নিশ্চয়। এই যে এতগুলো ভূত একসঙ্গে দেখেও তুমি অজ্ঞান হচ্ছ না। আমরা আমাদের ভূতবুদ্ধিতে এটার ব্যাখ্যা করতে পারছি না। আমাদের ধারণা তুমি কোন বিশেষ গুনের

অধিকারী। তাই আমরা একটু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে চাই।

সেই ঘরে একটা বেঁটে গুড়গুড়ে ভূত বুট জুতো পরে কম্পিউটারে নিয়ে বসেছিল। তার স্ক্রিনে ফুটে উঠতে থাকল নানান রকম ছবি। মাত্র কয়েক মিনিট। তারপরেই সে মতামত দিল যে, ওর মাথায় গিজগিজ করছে রাগ। সেই জন্যে সাধারন নিয়মগুলো কাজ করেনি।

সাগ্নিক বলল, হ্যাঁ আমার রাগ একটু বেশী। কিন্তু ভজহরিদাকে সশরীরে দেখেও অজ্ঞান না হয়ে যাওয়াটাতে ওর কোন দোষ ছিল না। তাই ওকে শাস্তি দেওয়াটা মোটেই তোমাদের উচিত হবে না। ভূঁড়িওয়ালা ভূত বলল, সেদিন ভজহরি তোমার সঙ্গে সশরীরে প্রায় আধঘন্টা কথা বলেছিল। এটা আমাদের সর্বোচ্চ মাত্রার অনেক বেশী।

- হতে পারে। কিন্তু সেটার সঙ্গে রাগের কোন সম্পর্ক নেই। আমি ওকে দেখে এমন গল্প জুড়েছিলাম যে ভজহরিদা অদৃশ্য হতে ভুলে গিয়েছিল।
- গল্প করতে গিয়ে সাধারন নিয়ম কানুনগুলো ভুলে যাওয়ার ফল তো খুব মারাত্মক হতে পারে। ভূত ও মানুষ উভয়ের পক্ষেই এটা ক্ষতিকারক।
- বন্ধুর সঙ্গে বন্ধু গল্প করলে ক্ষতি হবে কেন? তোমরা মানুষদের বন্ধু ভাবতে পারো না আর মানুষরাও তোমাদের বন্ধু ভাবে না তাই তো এত ঝামেলা। নাহলে মানুষরা তোমাদের দেখে অজ্ঞান হত না আর ভূতেদেরও এত নিয়ম কানুন আবিষ্কার করতে হত না।

সেই বেঁটে গুড়গুড়ে ভূতটি এতক্ষন চুপচাপ সব শুনছিল। এখন এগিয়ে এসে বলল,

- আমি এই স্কুলের হেডস্যার। আমি ভজহরির শাস্তিটাকে তুলে নিতে পারি। কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে। তোমাকে রাগ কমাতে হবে। কারন রাগ ভূতজগতে এবং মনুষ্যজগতে সমান নিন্দনীয় ও ক্ষতিকারক। আমাদের রিসার্চের রেজাল্ট অনুযায়ী ইচ্ছে থাকলে ও চেষ্টা করলে আশি শতাংশ পর্যান্ত রাগ সহজেই কমানো সম্ভব। এব্যাপারে ভজহরি তোমাকে প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দিয়ে দেবে। তোমাকে ঠিকঠাক শিক্ষা দিতে পারলে ভজহরির শাস্তি তুলে নেওয়া হবে।

ভজহরি চেঁচিয়ে বলে উঠলো, আমি রাগ ম্যানেজমেন্টের একটা ক্র্যাশ কোর্স ওকে আগেই করিয়ে দিয়েছি।

হেডস্যার শুনে অবাক। বলল, পরীক্ষা দিতে পারবে?

পরীক্ষার কথা শুনে বুকটা একটু কেঁপে গেল সাগ্নিকের। ভজহরিদা কানে কানে বলল,

- আরে, এই সুযোগে তুই ভিডিও গেমস খেলতে পাবি।

শুনে সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিল ও।
ওকে বসিয়ে দিল একটা অদ্ভূত দেখতে কম্পিউটারের সামনে। মাথায় লাগিয়ে দিল হেলমেট।

- ভজহরিদা, মাউস নেই, কী বোর্ড নেই। কি করে খেলবো?
- কিচ্ছু লাগবে না। মাথায় ওটা লাগানো আছে না? যা ভাববি তাই ঘটতে থাকবে। দেখ না কি হয়। শুধু মনে রাখবি বুদ্ধিমানেরা কখনো রাগ করে না।

সে এক রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনাময় খেলা। যেন অন্য এক পৃথিবীতে এসে পড়েছে। যেখানে ওর বাড়ি, স্কুল সবই আছে, আছে এমনকি ওর পরিচিতরাও সবাই। সবাই নানা ভাবে ওকে রাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু আজ সে কিছুতেই রাগল না। যখন খেলা শেষ হলো তখন তার মুখ ভর্তি জয়ের হাসি।

যারপরনাই খুশী ভজহরিও। পরীক্ষায় সসম্মানে উর্ত্তীর্ন হল সাগ্নিক। ভজহরির শাস্তি তো মকুব হলই। উপরন্তু হেডস্যার ঘোষণা করলেন যে, ভজহরি রাগ নিয়ে রিসার্চের দুনিয়াতে ভূতেদের জন্যে একটা নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। তাই ওকে স্কুলে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হবে। এবং ভূতসমাজ ছাড়িয়ে মনুষ্যসমাজের জন্যেও ওর এই বিশেষ অবদানের জন্যে ওকে একটি পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হবে।

রুচিরা
ব্যাঙ্গালোর, কর্ণাটক

ছবিঃ
কৌস্তুভ রায়
কলকাতা

রাজা ও রানী

রাজা নাম হলেও আসলে ও ভিখারীর ছেলে।ভিখারী আরজু ভিক্ষা করে দিন আনে দিন খায়। ভিখারীর ছেলের নাম রাজা শুনে আশপাশের লোকেরা হাসে।

আরজু বলে,নাম রাখতে কোনো বাধা নাই।আমি আমার ছেলের নাম রাজা রাখি আর ফকির রাখি--কার কি বলো?

কথাটা তিন সত্য। ভগবান এমন অনেক কিছু দিয়েছেন--যাতে রাজা ফকিরের সমান হক বলা যায়। মাথার ওপরের আকাশ,দিন ভর বয়ে যাওয়া বাতাস,রাতের চন্দ্র,সূর্য্য, গ্রহ, তারা--এ সবই তো সবার জন্যে!ধনীর শরীরের অঙ্গ প্রতঙ্গ যেমনটি হয় দরিদ্রেরও তাই! তবে কেন এ নিয়ে এত মাথা ব্যথা? আরজু ভিখারী বটে কিন্তু ইচ্ছে মত তার ছেলের নাম রাখার অধিকার তো তার আছে!

নীমা,রাজার মা,বলে ছিলো,ভিখারীর ঘরে আবার রাজা!

আরজু বৌকে বুঝিয়ে ছিলো,দেখ,নামে কি যায় আসে। আমাদের ছেলের নাম রাজা হলে ক্ষতি কি বল? মনের মত না হলেও নীমা,আরজুর বৌ,চুপ করে গিয়েছিল।

সেই রাজা,তিন বছরের ছোট্ট ছেলে।ঘরে বসে খেলা করে।খেলনা!নানা আকার প্রকারের টুকরো পাথর,ভাঙা বাক্স,শুকনো গাছের ডাল,আর বাপের কুড়িয়ে আনা একটা পুতুল,যার এক হাত নেই,এক পা নেই।এসব নিয়ে রাজা খেলে চলে আনন্দে।

কখনো পুতুল তুলে নিয়ে দেখে,ওর এক হাত নেই। তার নিজের হাত দুটো নাড়ে,আর পুতুলের হাতের বেমানান অবস্থা আন্দাজ করে!তেমনি পুতুলের এক পা আর ওর দু পা! এমনি ভাবনা ক্ষণেকের জন্যে এসেই আবার মিলিয়ে যায়।পর মুহূর্তেই সে পাথরের টুকরোগুলি নিয়ে খেলতে থাকে। কখনো সেগুল

ফেলছে,কখনো কুড়িয়ে নিয়ে আসছে। ফেলা আবার নিয়ে আসার মধ্যে কি সুন্দর খেলে যাচ্ছে রাজা! খেলার অভাব বোধ তার কোথায়!আনন্দে হাসছে,আনন্দে হাত তালি দিচ্ছে,পাথরে ঠোকা খেয়ে কাঁদছে...আবার খেলছে।

মা নীমার কোনো চিন্তা নেই।সে মাটির চুল্লিতে শুকনো ডালপালা গুঁজে দিয়ে ভাত ফুটা। ভাতের সঙ্গে দু টুকরো আলুও কখনো সখনো জুটে যায়।

রাজা খেয়ে নেয়।গপাগপ খেয়ে নেয়।মা কোনো দিন আধ সিদ্ধ আলু ভাতের সঙ্গে টিপে দেয়,অমৃতের মত রাজা তা খেয়ে নেয়। কোনো ব্যাপরে তার নতুন কোনো আব্দার নেই।

তিন বছরের রাজা কি নিজে নিজে খেতে পারে? হ্যাঁ,প্রায় দেড় বছর বয়স থেকেই রাজা নিজে নিজে খেতে শিখেছে। এ সব ভগবানের দান--গরীব ভিখারীর ঘরে এটা খাবো না,সেটা খবো না বললে চলে!না কি খাইয়ে না দিলে খাবো না বলে অভিমান করা সাজে!

সারাদিন বসে থাকে আরজু ও নীমা। মন্দিরের দেওয়াল ঘেঁষে বসে থাকে।তাদের সামনে বিছানো থাকে নোংরা চাদরের টুকরো।দয়ালু লোকেরা মন্দির দর্শনে আসেন।আর আরজু ও নীমার মত হাত জোড় করে বসে থাকা ভিখারীদের সামনে দিয়ে যান পয়সা।দিন ভর আরজু,নীমা এমনি ভাবে বসে থাক। নীমাকে মাঝে মাঝে ঘরে গিয়ে ছেলেকে দেখে আসতে হয়।

দিনের শেষে ওরা পাততাড়ি গুটোয়.দুজনের ভিক্ষার পয়সার হিসাব হয। নব্বই টাকা--ওরে বাবা অনেক!ওদের গড়ে দিনে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা রোজগার হয়। কোনো দিন বিড়ালের ভাগ্যে যদি সিকা ছেড়ে তবে একশ টাকার উপরেও জুটে যায়।সে দিন তো ওদের মহা আনন্দ!

এক বছর আগেও নীমা রাজাকে কোলে নিয়ে চাদর পেতে বসে থাকত.এখন আর তা হয় না,রাজাকে সামলে রাখা যায় না। ঘরের গন্ডির বাইরে সে পা না বাড়ালে কি হবে,বাইরে এলে সমস্ত খোলা জাগাটাই তার আপন মনে হয়। ছুটে যেতে চায় এখানে ওখানে। মহা কষ্টে ওকে সামলাতে হয়।

নীমা দেখল,রাজা দিব্যি থেকে যায় ঝুপড়ি ঘরে। বাঁশের কঞ্চিতে বাঁধা দরজা,বাঁশ খুঁটিতে কোনো মত ঠেকিয়ে রাখা ঝুপড়ি ঘর। বেশী দাপাদাপিতে ভেঙে পড়তে পারে।কিন্তু সে ভাঙ্গার চেষ্টা রাজা করেনি। ওই তিন বছরের রাজাও জানে তাকে ওই গন্ডিতে থাকতে হবে। নইলে সমূহ বিপদ। সূক্ষ্ম বিচারের অনুভূতি ঐটুকু ভিখারীর ছেলের মধ্যেও ঢুকে গেছে। ওই বোধ টুকু ভগবান যদি ওদের না দেন তবে ওরা বাঁচবে কি করে!

রানীদের ঘর রাজাদের ঝুপড়ি ঘরের সামনে। মাঝখান দিয়ে যাতায়াতের রাস্তা চলে গেছে। রানী একটি মেয়ের নাম। ধনী ঘরের মেয়ে রানী। চার তলা বিরাট বাড়ি ওদের।

চার বছর বয়েস রানীর।স্কুলে যায়। ডি.পী.সী.স্কুলে। রোজ সকালে স্কুলের গাড়ি আসে ওকে নিতে। বিকেলে ওই গাড়ি ওকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে যায়। পড়া লেখার চাপ বিশেষ নেই।হোম ওয়ার্ক--সে এক ঘন্টা বসেই শেষ করে নেয়।তারপর খেলা--কত রকম খেলনায় তার ঘর ভরা!কি নেই তাতে?চাবি দাও,মানুষ নাচে,গান করে। ট্রেন ছুটে চলে,পাখী উড়ে যায়। প্রকান্ড বড় বড় নানা রকম ডল। এ ছাড়া আছে রান্না বাটি খেলার সমস্ত সরঞ্জাম। যখন যে খেলা পছন্দ তাই নিয়ে খেলো!এত খেলনাও মাঝেমাঝে তার মন কাড়তে পারে না। নতুনত্বের খোঁজে সে বাবা মার কাছে বায়না ধরে--আরও

চাই,আরও পুতুল,অন্য অন্য রকমের!

তিন তলায় রানীর পড়ার ঘর,শোয়ার ঘরও সেটাই.বাবা মার সঙ্গেই শোয় ও।

একদিন সে ওই তিনতলা থেকে আবিষ্কার করল একটা বাচ্চা ছেলেকে।ওদের বাড়ির নীচে,রাস্তার ওপারের ঝুপড়ি ঘরে বসে আছে ছেলেটা। ওই ঘরগুলি কেমন ভাঙাচোরা। দরজা,জানালা,দেওয়াল--কোনো কিছুরই ঠিক নেই!বোরা,প্লাস্টিক কাগজ,বাঁশ কঞ্চির ঘেরায় তৈরী। ঘরে ছেলেটা খেলা করছে -একা একা--ঘরের দরজা আধ খোলা।ছাদের রেলিং ধরে রানী উঁকি মেরে দেখছিল। সেই ছেলে পাথরের টুকরো,গাছের ডালের টুকরো,ভাঙা পুতুল,বাক্স নিয়ে চুপ চাপ খেলা করছে।রানীর কাছে এ যেন এক আবিষ্কার।খেলা ধুলার ফাঁক,পড়া লেখার অবসরে ওই ছেলেটাকে দেখতে ও ছাদের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।ওর খেলা,ওর নাচানাচি,লাফালাফি সব কিছু দেখে রানী খুব আনন্দ পায়।

একদিন রানী দেখল রাজা খেলে বেড়াচ্ছে.ওদের ভাঙা ঘরের ফাঁক ফোঁকর দিয়ে যে রোদের আলো গিয়ে পড়েছে।তাই দিয়ে ও খেলছে।কখনো ও ধরতে যাচ্ছে রোদের টুকরো,কখনো সে দেখে তার নিজের গায়েই লেগে আছে ওই টুকরো রোদ।ঝিকির মিকির রোদের খেলনা দেখতে দেখতে রাজা হাততালি দিয়ে উঠছে।খেলার এ দৃশ্য দেখে রানী নিজের অজান্তে হাততালি দিয়ে উঠলো।রাজার কান পর্যন্ত পৌঁছালো সে তালির শব্দ।হাততালির শব্দ মিলিয়ে রাজা ওদের আধ খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে রানীকে দেখতে পেল। দেখল তার মতই ছোট একজন--যে হাততালি দিয়ে তার দিকেই তাকিয়ে আছে।খুব আনন্দ হলো ওর।আনন্দে সেও রানীর দিকে তাকিয়ে আবার হাততালি দিয়ে উঠল।

দূরত্ব যাই থাক,রাজা রানী এখন বন্ধু। এ ওকে দেখে হাসে,হাততালি দেয়।
দূর থেকেই রানী তার খেলনা দেখায়। নতুন খেলনা দেখে চুপ করে রাজ কিছু সময় দেখে নেয়। তারপরেই সে তার চকমকি পাথর রানীর দিকে তুলে ধরে।

রানী অবাক হয়। রাজার হাতে চকচক করছে যে খেলনা--তেমনটা তো সে কখনো দেখে নি!

রানীকে স্কুল যাবার জন্যে নীচে নেমে আসতে হয়। বাবা মা কেউ না কেউ তাকে বাসে চড়িয়ে দেন। এই সময়টুকুর ফাঁকে সে রাজাদের ঘরের দিকে তাকিয়ে নেয়। যদি রাজার দেখা পায়,যদি তার দূর থেকে দেখা চকমকি খেলনার রহস্যের খোঁজ পাওয়া যায়!

মাঝে মাঝে দেখা হয়ে যায় রাজার সঙ্গে।আবার কোনো দিন বুঝতে পারে রানী--ওই ঝাটিমাটির দরজার,দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে দুটো চোখ যেন জুলজুল করে তার দিকে তাকিয়ে আছে!

--বাস এসে গেছে রানী!

কখনো বাবা বা মার কথায় সম্বিত ফিরে পায় রানী। তাড়াতাড়ি গিয়ে বাসে ওঠে।

রাজা ওই মেয়েটাকে ভালো ভাবে চেনে,ছোট্ট রাজার জীবনের দূর থেকে দেখা রানী সে!অনেক সময় সে দেখতে থাকে রানী গাড়িতে উঠে চলে যায়,গাড়িতে আবার সে ঘরে ফিরে আসে।

একদিন রানী তার মা,অনিমাকে ডেকে দেখায়,মা,দেখ,দেখ না!
--কি,কি দেখব?মা বলে ওঠেন।
--ওই ঘরে না একটা ছেলে থাকে।আমার বড় ডলের মত ও!রানী বলে যায়.

মা দেখবার চেষ্টা করেন ছেলেটাকে। বলেন,কে,কোথায় ছেলে?
--ওই দেখ,ভাঙ্গা মত ঘরটার ফাঁক দিয়ে দেখ,রানী উত্সাহ নিয়ে বলে ওঠে।
--ও গুলো বস্তি বাড়ি,গরীব ভিখারীদের ঘর,বলেন রানীর মা।
--কিন্তু ও তো ভিখারী না মা,ও ঘরেই বসে থাকে। খেলা করে। আমায় ওর খেলনা দেখায়।ঘরের দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আমায় হাত দেখায়।বলে চলে রানী।
--ওর মা,বাবা,ভিখারী,কালী মন্দিরের সামনে ভিক্ষার জন্যে সারা দিন বসে থাকে,মা বলে যেতে থাকেন।
রানী ভিখারী ধনীর পার্থক্য বোঝে না।ও বলে,না,মা,ও ভিখারী না,সুন্দর দেখতে,আমায় খেলতে ডাকে। এক দিন যাবো ওর ঘরে?
--না,না,ওরা খুব নোংরা থাকে,ওদের ঘরে গন্ধ,ওখনে গেলে ভালো লাগবে না তোর। রানীর মা বোঝাতে থাকেন মেয়েকে।

তবু রানী মানতে চায় না,বলে কই আমি তো পাই না!আমি তো গন্ধ পাই আমাদের বাড়ির পাশের নর্দমার!

কথা বলতে বলতে রানী হঠাৎ দেখতে পায় রাজা ওর দিকে তাকিয়ে আছে। দরজার ফাঁক দিয়ে একটা হাত বাড়িয়ে সে রানীকে ইশারায় ডেকে যাচ্ছে।রানীও হাত নাড়ে,মাকে বলে ওঠে,ওই দেখ,ওই দেখ মা,ও আমায় ডাকছে!

রানীর মা,অনিমা দেখলেন ঝুপড়ির দরজার ফাঁক দয়ে ছোট্ট একটা ছেলে দাঁড়িয়ে। রানীকে হাত নেড়ে ডেকে চলেছে ও। ছেলেটা দেখতে ভালো।ছোট্ট বাচ্চা।বাচ্চা ছেলে কার না ভালো লাগে!

রানী,মা বাবার একমাত্র সন্তান। ওঁদের ইচ্ছে ছিলো রানীর একটা ভাই হোক।কিন্তু সে ইচ্ছা আর পুরন হয় নি।

সে দিন তাড়াতাড়ি স্কুল ছুটি হয়ে গেল। স্কুলবাস রানীকে ঘরে পৌঁছে দিল। স্কুলের আগে ছুটি হবার কথা কারো জানা ছিলো না,তাই রানীকে নীচে থেকে নিয়ে যেতে কেউ এলো না। একটু সময় সে চুপ চাপ বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। এমনি সময় তার মনে পড়ল বন্ধুর কথা। ও তাকালো সামনের বস্তির দিকে। ওই যে বস্তির ঘরগুলি।এরই একটাতে থাকে তার বন্ধু। রানী এগিয়ে গেল।খুঁজতে লাগলো সেই ঘরটা যাতে থাকে তার বন্ধু.এখনো সে বন্ধুর নাম জানে না!

রানী চিনতে পারলো,ওই তো ঐটাই রাজাদের ঘর।এগিয়ে গেল ও।বাঁশ কঞ্চির তৈরী দরজা,বাইরে থেকে ঘরে কেউ আছে বলে মনে হলো না।কাছে গিয়ে দরজার ফাঁকা দিয়ে উঁকি মারলো রানী।শুরুতে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই তার চোখে পড়ল না।কিছু সময় পরেই ও দেখতে পেল,ঘুমোচ্ছে,তার বন্ধু ঘুমোচ্ছে! ঘরে আর কেউ নেই!

বন্ধুকে ডেকে উঠলো সে,এই,এই,এই...না,কোনো সাড়া নেই। এবার দরজায় ধাক্কা লাগলো রানী,একবার, দুবার,তিনবার,না ঘুম ভাঙ্গে না!দরজায় চড়ে চীত্কার করে ডাকবে কি না ভাবলো,দরজার ওপর অনেকটা ফাঁকা। ও ভাবলো দরজায় চড়ে ওই ফাঁকা জাগা দিয়ে ওকে ডাকলে কেমন হয়!দরজায় দুপা উঠতে গিয়েই ঘটে গেল বিপদ।লড়বড়ে দরজা নিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেলো রানী. একেবারে ঘরের মধ্যে গিয়ে পড়ল।আচমকা ভয় পেয়ে গেল ও।পড়ে গিয়েই জোরে চীত্কার করে কেঁদে উঠলো।ওদিকে রাজার ঘুম ভেঙে গেল,সেও ভয় পেয়ে কেঁদে উঠলো। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে দু তিন বার কান্নার সুর টেনে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো!উভয়ের মুখে ধীরে ধীরে হাসি ফুটল।

রানী বলল,তোর নাম কি?

রাজা আধো কথা বলতে শিখেছে।খানিক তুতলে সে বলে উঠলো,নাজা!
--আমার নাম রানী.তুই আমায় চিনিস?রানী প্রশ্ন করল।
কথা বলল না রাজা,এক ধরণের চিনতে পারার হাসি হাসল।
--জানিস আমি ওই বাড়িতে থাকি,বলে আঙ্গুল দিয়ে রাস্তার ও পারের বড় বাড়িটা দেখিয়ে দিল রানী। রাজা বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকলো,তারপর ওপরে যেখানে রানী দাঁড়িয়ে থাকে রাজা তার আঙ্গুল দিয়ে সে জায়গাটা দেখালো।আর হাসতে হাসতে বলতে লাগলো,উখানে,উখানে ...
তুই কি খেলিস দেখাত আমাকে?চল আমরা খেলব.রাজাকে রানী বলে।

রাজা পরম উত্সাহে ঘরের এক কোন থেকে সব টেনেটুনে বের করে আনে। খেলার সমস্ত সরঞ্জাম তাতে রাখা।

রানীর খুব ভালো লাগলো।রাজার ছোট,বড়,সাদা,লাল,কালো,নানা রঙের পাথরগুলি,সত্যি দেখতে বেশ সুন্দর--এমন জিনিস তো তার কাছে নেই!

রাজাদের ঘর খুব নোংরা,ভাঙা,রানীর একদম ভালো লাগলো না.কিন্তু রাজা?সে তো ভালো,সুন্দর হাসে,সুন্দর আধ-আধ কথা বলে!দূর থেকে ইশারায় তাকে ডাকে।যেন কত দিনের বন্ধু ওরা!
এদিকে সময় কেটে গেছে অনেক।এতক্ষণ নিয়ম মত স্কুল বাসের এসে যাবার কথা। রানীর মা বাসের অপেক্ষায় ঘরবার করছেন।ব্যালকনি থেকে বারবার বাস এলো কিনা দেখছেন।কে জানে,এত দেরী হচ্ছে কেনো বাস আসার!

অগত্যা স্কুলে ফোন করা হল। জানা গেলো বেলা একটায় আজ ছুটি হয়ে গেছে।শুনে ভয় পেয়ে গেলেন

রানীর মা।

ঘরের চাকর দীনু। ওকে পাঠানো হলো নীচে।রাস্তার আশপাশ,অলি গলিতে খুঁজে দেখতে।

রানীকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।রানীর বাবাকে ফোন করা হলো।খবর শুনে রানীর বাবা আঁতকে উঠলেন...আমি এক্ষুনি আসছি,বলে ফোন রাখলেন তিনি।

তখন সন্ধ্যে হয় হয়।রানীর মা কেঁদেকেটে অস্থির হয়ে গেলেন।রানীর বাবা স্কুলে খোঁজ নিতে গেলেন। এমনি সময় রানীর বাড়ির কথা মনে পড়ল। ধীরে ধীরে বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো।

মা কাঁদতে কাঁদতে ঘরের দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন।সামনে মেয়েকে দেখে,কোথায় ছিলি,বলে জাপটে ধরলেন।
--আমি না বন্ধুর বাড়ি গিয়ে ছিলাম,রানী বলে ওঠে।

এবার ধমকে ওঠেন মা,না বলে কেন গিয়ে ছিলে?জানো না আমরা তোমার জন্যে কত চিন্তা করছি!
--কোথায় গিয়েছি!এই তো পাশে,সহজ ভাবে রানী বলে ওঠে।
--চুপ!আমরা চিন্তা করি তুমি জানো না বুঝি?মা আবার ধমকান।
--ঠিক আছে,না বলে আর যাব না,কেমন?রানী পাকা বুড়ির মত বলে চলে,আমার বন্ধু ওখানে থাকে তাই একটু গিয়ে ছিলাম।

মা আর থাকতে পারলেন না,মেয়েকে জাপটে ধরে কাঁদতে থাকলেন।

সে দিন ছুটির দিন ছিলো,রবিবার।তখন রাত দশটা হবে। রাজাদের বস্তিঘরগুলিতে কিভাবে যেন আগুন লেগে গেলো। আটদশ ঘর একের পর এক দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো.চারি দিকে চীত্কার চেঁচামেচি
-- আগুন,আগুন,করে সবাই ছুটোছুটি করতে লাগলো।বস্তির লোকেদের কান্নার রোল পড়ে গেলো।

হইহট্টগোল,কান্না চেঁচামেচিতে রানীর ঘুম ভেঙে গেলো। ধড়ফড় করে সে উঠে বসলো। দেখল মা,বাবা,কেউ তার পাশে নেই। ও ভয় পেয়ে চীত্কার করল।ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো।মা,বাবাকে দেখলো ছাদের কার্নিশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন।নীচে জ্বলে যাচ্ছে রাজাদের ঘরগুলি!

মা,বাবার কাছে তাড়াতাড়ি ছুটে গেলো রানী। সে চীত্কার করে কেঁদে উঠলো,আমার বন্ধু,আমার বন্ধু কই!

নীচে তখন বস্তির সব ঘর আগুনে ভস্মিভূত হোয়ে গেছে।

রানী প্রচন্ড চীত্কার করে কেঁদে বলে উঠলো,আমার বন্ধু কই!আমার বন্ধু কই?সিঁড়ি দিয়ে তড়তড় করে নীচে নেমে যেতে লাগলো। বাবা,মা'র শত বাধা ওকে যেন বাধ মানাতে পারছে না। রানী চীত্কার করে একই কথা বলে চলেছে,আমার বন্ধু,আমার বন্ধু কই!

জোর করে বাবা,মা তাকে আটকে রাখলেন। তাঁদের মনও ভালো নেই।রানীর বন্ধু,রাজার চিন্তা ওদের মনকেও বিষন্ন করে তুলেছে।

রাত শেষে ঘুমিয়ে পড়ল সবাই। ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্গলো সবার। রাতের দুঃস্বপ্নের ঘোর রানীর তখনও কাটে নি। মুখ চোখ তার শুকিয়ে গেছে।

বেলা দশটার পরে দীনু খবর নিয়ে এলো,ঝুপড়ি ঘরের ছেলেটার মা,বাবা,কাল রাতে পুড়ে মারা গেছে। ছেলেটা কি ভাবে যেন বেঁচে গেছে!

রানী জোরে কেঁদে উঠলো,রাজা,আমার রাজা কোথায় আছে বলো?

দীনু বলে,হ্যাঁ,রাজা নাম ছেলেটার,ও বেঁচে আছে।

রানীর মা,বাবা খুব দুঃখ পেলেন। মেয়ের দুঃখে ওঁরা বেশ চিন্তিত হলেন। সত্যি বন্ধুকে তাদের মেয়ে খুব ভালোবাসে।রানীর বাবা কিছু সময় ভেবে বলে উঠলেন,দিনু একটা কাজ করতে পারবে?
--কি?বলুন না বাবু!বিনত দীনু বলে ওঠে।
--একবার রাজা ছেলেটাকে এনে আমাদের দেখাতে পারবে? বাবা ধীর স্বরে বলে উঠলেন।
--বলেন যদি,দেখতে পারি,আনতে পারি কি না!দীনু বলে।

ঠিক দুপুর বেলা,দীনু রানীর বন্ধু রাজাকে কোলে নিয়ে হাজির হল।তখন কাঁদছিল রাজা,মুখ চোখ কেমন লাল লাল তার।ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছিল।

রানীর মুখে হাসি ফুটে উঠলো,দৌড়ে সে রাজার কাছে এসে দাঁড়ালো।

সুন্দর ছেলে রাজা।শরীরে কোথাও ভিখারীর ছেলে বলে লেখা নেই।রানীকে দেখা মাত্র কান্নার মধ্যেই সে কেমন হেসে উঠলো!

রানীর মা,বাবার দু জনের মনে একই কথা মনে হচ্ছিল,ভিখারীর অনাথ ছেলেটা বেশ সুন্দর।তাদের তো কোনো পুত্র সন্তান নেই।এই অনাথ ছেলেটিকে যদি ছেলে বলে মেনে নেওয়া যায়!ছেলের মত স্নেহ ভালোবাসা দেওয়া যায়!কেমন হয় তা হলে?

এমনি সময় দীনু দুঃখে কাতর হয়ে বলে ওঠে,ওর আর কেউ নেই গো,ও একা হয়ে গেলো,বেচারা!
রানীর বাবা যেন আর থাকতে পারলেন না,সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন,আমরা আছি দীনু,আজ থেকে ও আমাদের এখানে থাকবে।

রানীর মা অবাধ খুশিতে কেঁদে ফেললেন। রানীর বাবাকে বলে উঠলেন,আমার মনের কথাটা তুমি বলে দিলে গো!

রানী তো খুব খুশি,উচ্ছল আনন্দে সে ডেকে উঠলো,বন্ধু!

রাজা তাকালো রানীর দিকে,তারপর তুতলিয়ে বলে উঠলো,ব ন ধু উ...!

তাপসকিরণ রায়.
জবলপুর, মধ্য প্রদেশ

ছবিঃ
কৌস্তুভ রায়, কলকাতা

ছুটি আর ছুটির মন

আজ সকাল থেকেই ছুটির মনটা তাধাই নাধাই আগাডুম্ বাগাডুম্ তিড়িং বিড়িং করছে। পড়ায় মন নেই। অবাধ্য মন কেবলই ছুটে যাচ্ছে বই থেকে। মা বাবা পিন্টুকাকুর বাড়ি গেছেন। পিন্টুকাকুর বাড়ি বাবা, মা প্রায়ঃশই যান। পিন্টুকাকু বাবার কেমন যেন দূরসম্পর্কের ভাই হন। মা যাবার সময় বলে গেছেন সব হোমওয়ার্ক শেষ করে রাখতে। হোমওয়ার্ক করা তো দূরের কথা। ছুটির মাথায় লাল, নীল, হলুদ, সবুজ নানারঙের ঢেউ। ঢেউগুলো কখনো থেমে থাকছে না। বিভিন্ন আকার অবয়ব নিচ্ছে ক্রমাগত। কখনো ত্রিভূজ, কখনো বর্গক্ষেত্র, কখনো আয়তক্ষেত্র, কখনো বা সম্পূর্ণ একটা রঙবাহারের বৃত্ত। তারই মধ্যে একটা অস্পষ্ট মুখ চিন্তাটাকে ভেঙেচুরে দিচ্ছে। ছুটির খুব কান্না পাচ্ছে। কেন এমন হয়?

সকাল থেকেই মনের কোন তল পাচ্ছে না সে। ঘুম থেকে উঠেই বাইরেটা দেখে ছুটির মনটা খুশীতে ভরে উঠেছিল। বৃষ্টিধোয়া সতেজ সবুজ দিনে আকাশ জুড়ে রামধনু দেখে ছুটির মনে আনন্দের বুদ্ বুদ্। কাল সারারাত্তির বৃষ্টি হয়েছে। এখন মেঘ কেটে পরিষ্কার আকাশে নানারঙের খেলা। রোদ ঝলমলে দিন হলেই ছুটির মন ভালো হয়ে যায়। মনের মধ্যে রিন্ রিন্ ঝিন্ ঝিন্ করে। ইস্কুলে যেতে মনখারাপ হয় না। আজ অবশ্য ছুটির ইস্কুল নেই। গতকাল থেকে গরমের ছুটি পড়েছে। এমনিতে ছুটি ইস্কুলে যেতে ভালোবাসে না। সে পড়াশোনায় খারাপ না। কিন্তু ইস্কুল তার একদম ভালো লাগে না। চারদেয়ালের মধ্যে ছুটির দম বন্ধ লাগে। কিন্তু আজ দিনটা অন্যরকম। ইস্কুল নেই। তার ওপরে চনমনে রোদ। ঘুম থেকে উঠেই ছুটির ভালোলাগায় মনটা ভরে উঠেছিলো।

এমনি সময়েই চোখে পড়লো মেয়েটাকে। ছুটিরই বয়সী। জামাকাপড় ময়লা। কাদা ভর্তি পা নিয়ে মুখ কালো করে বসে আছে। মুখটা খুব করুণ। ছুটির মনটা খারাপ হয়ে গেল। এমন দিনে কেউ মনে দুঃখ নিয়ে বসে থাকতে পারে? রোদ্দুর আর নানাবাহারের রঙের খেলা। তবুও মনে দুঃখ? কিসের কষ্ট ওর?

আর তারপর থেকেই মনটা ছুটির ছুটে গেছে। কারোর মনেই কষ্ট দেখতে পারে না ছুটি। ঠাম্মা বলেন

ছুটির মনটা সমুদ্রের মতো অতল, অন্তহীন, গভীর। সবার জন্যই ছুটির মন কাঁদে। বাড়ির কাজের বুড়ি মা, দুধওয়ালা, বাড়িতে ধূপ বিক্রি করতে আসা বুড়ো লোকটা – সবাইকে দেখেই ছুটির কষ্ট হয়। আজকে ওই মেয়েটা ছুটির মনটা উল্টোপাল্টা করে দিয়েছে। অঙ্ক, ভূগোল, বিজ্ঞান – কোনকিছুতেই মন লাগছে না তার আর। বাবা, মা চলে গেছেন কখন। কিন্তু দুটো দাগও দেয়নি সে খাতায়। কেন তার এত লাগামছাড়া মন? তার এমন কেন হয়?

নাম-না-জানা একটা কষ্ট ছুটির মনে। মেয়েটার মুখটা তার চোখের সামনে ছবি হয়ে আছে। ছুটি কষ্টটাকে রূপ দিতে পারছিলো না। মেয়েটার মুখটা রামধনুর লাল, নীল, বেগুনি রঙের সঙ্গে মিলেমিশে ঢেউয়ের মতো দুলছিল। আর ঠিক তখনই ছুটির রঙ, তুলি নিয়ে বসার ইচ্ছে হল। ছুটির মন খারাপ হলেই ছুটি আঁকতে ভালোবাসে। সাদা পাতায় জলরঙ ছাড়তেই আস্তে আস্তে বৃষ্টিধোয়া পৃথিবীতে ঘড়বাড়ি, গাছপালা সব কেমন ফুটে উঠতে লাগলো। তারমধ্যেই সাত রঙা রামধনু। ছুটির চোখ থেকে বড়ো বড়ো দুইফোঁটা জল পড়লো সাত রঙা রামধনুর মধ্যে। আস্তে আস্তে বিন্দুদুটো ছড়াতে ছড়াতে ছুটির চোখের সামনেই একটা অস্পষ্ট অবয়ব নিতে থাকলো। ঝাঁকড়া চুলের বড়ো বড়ো চোখের ফ্রক পড়া মেয়েটাকে বেশ চেনা যাচ্ছে। আকাশছোঁয়া রামধনুর একপ্রান্ত মেয়েটার হাতে ধরা। ময়লা জামাকাপড় আর চোখে পড়ে না। রামধনুর রঙে ধুয়ে গিয়েছে তার কাপড়জামা। মুখে একচিলতে হাসি। সাতরঙা রামধনুকে ধরে ফেলেছে যে সে! মনে তাই আর কোনও দুঃখ নেই তার। রামধনু কি সবাই ছুঁতে পারে না সবাই ছুঁতে চায়? ছুটির মনটাও ভালোলাগায় পিড়িং পিড়িং করে উঠলো। হঠাৎই মনে আর কোনও দুঃখ জরইলো না তার আর। এবারে হোমওয়ার্কটা শেষ করে ফেলতে হবে। মা, বাবার আসার সময় হয়ে এলো যে।

ঊর্মিঘোষ-দস্তিদার (দত্তগুপ্ত)
নিউ ইয়র্ক, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

ছবিঃ
কৌস্তুভ রায়, কলকাতা

বিদেশী রূপকথা: কুকুর কেন বিড়ালকে অপছন্দ করে

এক সকালে যখন তার ছেলে কাজের খোঁজে বেরচ্ছিল, তখন বুড়ি ওয়াং তাকে বলল, "আগামিকাল আমরা কি খাব, আমি ভেবেই পাচ্ছি না।"

"ওহ, ঈশ্বর সে ব্যবস্থা করবেন। আমি কিছু টাকা আনার চেষ্টা করি", হাসিমুখে বলল তার ছেলে, যদিও সে নিজেও মনে মনে জানত না কি ভাবে কি হবে।

শীতকাল খুব খারাপ কেটেছেঃ প্রচন্ড ঠান্ডা, পুরু বরফ, আর তীব্র হাওয়া। ওয়াং দের বাড়ির অবস্থা শোচনীয়। পুরু বরফের ভারে ছাদ ভেঙ্গে পড়েছে। তারপরে এক বিরাট ঝড়ে একটা দেওয়াল ভেঙ্গে পড়েছে, আর ওয়াং দের ছেলে, মিং-লি, সারারাত ঠান্ডা বাতাসে জেগে বসে থেকে, সর্দিজ্বর বাঁধিয়েছে। অনেকদিন অসুস্থ ছিল সে, তার ওষুধ কেনার জন্য খরচা হয়ে গেছে জমানো টাকা। যেটুকু টাকা পয়সা ছিল সব শেষ হয়ে গেছে, আর মিং লি যে দোকানে কাজ করত, সেখানে অন্য লোক কাজ করছে। যখন সে শেষ অবধি বিছানা ছাড়ল, তখনো ভারি কাজ করার পক্ষে তার শরীর খুব দুর্বল, আর আশেপাশের গ্রামে তার করার মত কোন কাজ ছিল না। রাতের পর রাত সে বাড়ি ফিরে আসত, চেষ্টা করত ভেঙ্গে না পড়তে, কিন্তু তার মা'কে খাবার এবং পোষাকের জন্য কষ্ট পেতে দেখে এই ভাল ছেলের মন দুঃখে ভরে যেত।

"ঈশ্বর ওকে রক্ষা করুন!" ছেলের চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে তার মা বলল।" কোন মায়ের এত ভাল ছেলে হয় না। ওর কথা সত্যি হোক যে ঈশ্বর আমাদের যোগান দেবেন। গত কয়েক সপ্তাহে যা খারাপ অবস্থা গেছে তাতে মনে হচ্ছে আমার পেটটা যেন একটা ধনী লোকের মাথার মতই ফাঁকা। ইঁদুরগুলি পর্যন্ত আমাদের কুঁড়েঘর ছেড়ে চলে গেছে, পুষির জন্য কিচ্ছু নেই, আর বুড়ো ভুলুর তো না খেতে পেয়ে মরমর দশা।"

যখন বুড়ি তার পোষ্যদের দুঃখের কথা বলছিল, তার কথায় সায় দিয়ে ঘরের কোণ থেকে একটা

করুণ মিউ মিউ আর হতাশ ঘৌ ঘৌ ডাক ভেসে এল, যেখানে পুষি আর ভুলু ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচতে একসঙ্গে কুন্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিল।

ঠিক তখনি বাগানের দরজায় একটা জোরে আওয়াজ শোনা গেল। ওয়াং বুড়ি ডেকে উঠল, "ভেতরে এস!" সে অবাক হয়ে দেখল, দরজায় একজন বুড়ো টাক মাথা পুরুত দাঁড়িয়ে আছে। এই অতিথি কিছু চাইতে এসেছে সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে সে বলতে থাকল, "মাপ কর বাছা, কিন্তু আমার কাছে দেওয়ার মত কিছু নেই। আমরা গত দুই সপ্তাহ ধরে কোনমতে খেয়ে থাকছি - তলানি, টুকরো -টাকরা খেয়ে - আর এখন খালি বসে ভাবি আমার স্বামী বেঁচে থাকার সময়ে আমরা কত খেতাম। আমাদের বিড়ালটা এত মোটা ছিল যে চাল বেয়ে উঠতে পারত না। এখন ওকে দেখ একবার। ও কত রোগা হয়ে গেছে। না, আমাকে মাপ কর পুরুতমশাই, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব না, তুমি বুঝতেই পারছ কেন।"

"আমি ভিক্ষা চাইতে আসিনি, " তার দিকে দয়ালু চোখে তাকিয়ে সেই মানুষটি বললেন, "আমি দেখতে এলাম তোমাকে কি ভাবে সাহায্য করতে পারি। দেব-দেবীরা তোমার অনুগত ছেলের নিরন্তর প্রার্থনা শুনেছেন। তাঁরা তাকে সম্মান করেন, কারণ সে তোমার জন্য ত্যাগ স্বীকার করবে বলে, তোমার মরে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করেনি। তাঁরা দেখেছেন, অসুখের পর থেকে সে কিভাবে তোমার সেবাযত্ন করেছে, আর এখন, যখন সে দুর্বল আর কাজ করতে অক্ষম, তাঁরা ঠিক করেছেন তার সুকৃতির জন্য তাকে পুরষ্কৃত করবেন। তুমিও একজন ভাল মা, আর তাই আমি যে উপহারটা এনেছি সেটা তুমি পাবে।"

"কি বলতে চাইছ তুমি?" ওয়াং বুড়ি তোতলাতে থাকল। সে নিজের কান কে বিশ্বাস করতে পারল না যে একজন পুরুত তাকে আশীর্বাদ করছেন।"তুমি কি আমাদের দুর্ভাগ্যে হাসতে এসেছ?"

"একদমই না। এই যে আমি আমার হাতে ধরে আছি একটা ছোট্ট সোনালি গুবরে পোকা, যেটার জাদু শক্তির সম্পর্কে তুমি ভাবতেই পারবে না। আমি এই দারুণ জিনিষটাকে তোমার কাছে রেখে যাব, এটা একটা ভাল উপহার, যেটা তোমাদের উপহার পাঠিয়েছেন সু-সম্পর্কের দেবতা।"

"হ্যাঁ, এটা ভাল দামে বিক্রি হবে," ছোট্ট গয়নাটাকে ভাল করে দেখে বুড়ি বিড়বিড় করে বলল, " আর আমাদের অনেকদিনের যবের যোগান দেবে। ধন্যবাদ, পুরুতমশাই, আপনার দয়ার জন্য।"

"কিন্তু তুমি কোনভাবেই এই সোনালি গুবরে-পোকাটিকে বিক্রি করতে পারবে না, কারণ এটার শক্তি আছে সারা জীবনের মত তোমাদের পেট ভরে রাখার।"

পুরুতের অবাক করা কথা শুনে বুড়ির মুখ হাঁ হয়ে গেল।

"হ্যাঁ, তুমি আমাকে সন্দেহ কর না, বরং আমি যা বলছি, মন দিয়ে শোন। যখনি তোমার খাবার লাগবে, তুমি এই ছোট্ট গয়নাটাকে এক কেটলি ফুটন্ত জলে ফেলে দেবে, আর যা খেতে চাও, সেই খাবারের নাম আওড়াতে থাকবে। তিন মিনিটের মাথায় ডাকনা খুলে দিও, আর তোমার গরমাগরম খাবার তৈরি পাবে, যা অন্য যেকোন খাবারের থেকে অনেক বেশি সুস্বাদু।"

"আমি কি এখন চেষ্টা করতে পারি?" বুড়ি উতসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করল।

"আমি চলে গেলেই পারবে।"

দরজা বন্ধ করে দিয়ে, বুড়ি তাড়াতাড়ি আগুন জ্বালালো, জল ফুটাল, আর তার মধ্যে সোনালি গুবরে-পোকাটাকে ছেড়ে দিয়ে আওড়াতে লাগলঃ

"ওলো পোলাও, ওলো পোলাও, আয়রে আমার কাছে,
না খেয়ে খেয়ে বাছা আমার রোগা হয়ে গেছে,
গরম গরম পোলাও, আয়রে তাড়াতাড়ি
শিগগির এসে ভর্তি কর আমার ফাঁকা হাঁড়ি"

সেই তিন মিনিট সময় কি আর কাটে? পুরুত কি সত্যি কথা বলেছিল? কেটলির ভেতর থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখে উত্তেজনায় তার তো মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার যোগাড়। ঢাকনাটা খুলে এল! সে আর অপেক্ষা করতে পারল না। ওহ, কি অবাক করা দৃশ্য! তার অবিশ্বাসী চোখের সামনে, পাত্রভর্তি সুগন্ধযুক্ত পোলাও - তেমন পোলাও সে জীবনে কোনদিন চেখে দেখেনি! সে হামলে পড়ে খেতেই থাকল, যতক্ষণ না তার লোভি পেট একদম ভরে গেল, আর তারপরে সে কুকুর আর বেড়ালটাকে এত খাওয়াল যে তাদের পেট ফেটে যাওয়ার যোগাড়।

" অবশেষে ভাগ্য ফিরল," বাইরে রোদে শুয়ে ফিসফিস করে পুষি বেড়ালকে বলল ভুলু কুকুর। "আমি বোধ হয় খাবারের খোঁজে না বেরিয়ে আর এক সপ্তাহও টিকে থাকতে পারতাম না। আমি জানিনা ঠিক কি হল, তবে দেব দেবীদের মতি বোঝা ভার।"

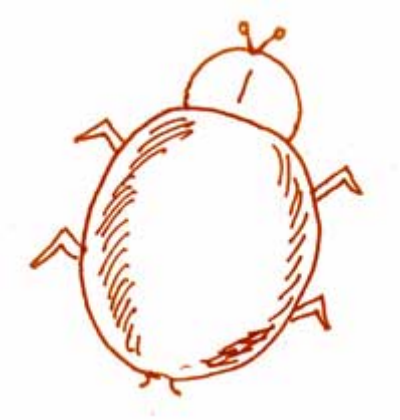

ছেলে ফিরে এলে তাকে কেমন ভোজ খাওয়াবে, সেটা ভাবতে ভাবে ওয়াং বুড়ি মনে আনন্দে প্রায় নেচেই ফেলল।

"আদরের ছেলে আমার, সে আমাদের ভাগ্য দেখে কতই না অবাক হবে - আর সবই কিনা হয়েছে সে তার বুড়ি মা'কে যত্ন আত্তি করেছে বলে।"

যখন মিং-লি ফিরে এল, মুখ গম্ভীর করে,তার মা তার মুখ দেখেই বুঝল খবর ভাল নয়।

"এস, এস বাছা!" সে ডেকে উঠল, " হাত মুখ ধুয়ে নাও, আর মুখে হাসি আন, কারণ দেবতারা আমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন আর আমি খুব দ্রুত তোমাকে দেখাব আমার প্রতি তোমার ভালবাসার জন্য তুমি কেমন পুরষ্কৃত হয়েছ।" এই বলে, সে ফুটন্ত জলের মধ্যে সোনালি গুবরেপোকাটাকে ফেলে দিয়ে আগুণ খোঁচাতে লাগল।

মিং-লি গম্ভীরভাবে তার দিকে তাকিয়ে ভাবল, মা নিশ্চয় খিদের চোটে পাগল হয়ে গেছে। এই দুঃখও দেখার ছিল। সে কি তার নিজের পরণের শেষ পোষাকটি বিক্রি করে কয়েক পয়সা যোগাড় করে মায়ের জন্য যব কিনে আনবে?

ভুলু এসে তার হাত আদর করে চেটে দিল, যেন বলতে চাইল, " আর দুঃখ কর না তুমি, আমাদের ভাগ্য এবার খুলেছে।" পুষি এক লাফে বেঞ্চে উঠে পড়ে মনের আনন্দে মিউমিউ করতে লাগল।

মিং-লিকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। পলক ফেলতে না ফেলতেই সে শুনতে পেল তার মা ডাকছে-

" টেবিলে এসে বস বাবা, আর এই পোলাওটা গরম থাকতে থাকতে খেয়ে ফেল। "

সে কি ঠিক শুনছে? সে ভুল কিছু শুনল না তো? না, ওই তো টেবিলের ওপর এক বিশাল থালা ভর্তি সুস্বাদু পোলাও, যা পৃথিবীর মধ্যে সে সবথেকে বেশি ভালবাসে, অবশ্যই, তার মা'কে ছাড়া।

"খেয়ে নাও, আর কোন প্রশ্ন কর না" বুড়ি ওয়াং বলল। "তোমার খেয়ে পেট ভরলে আমি তোমায় সব কিছু বলব।"

ভাল কথা! ছেলের হাত পোলাওএর থালার ওপর দ্রুত চলতে থাকল। সে মনের খুশিতে অনেক খেল, আর তার মা তাকে অবশেষে পেট ভরে খেতে দেখে সত্যিই খুশি হল। কিন্তু সেই বুড়ি তার ছেলেকে এই অসাধারণ রহস্যটা জানানোর জন্য এতই উতলা ছিল, সে তো আর ধৈর্য্য ধরে রাখতেই পারেনা।

"শোন, বাছা!" সে আর থাকতে না পেরে ছেলের খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই বলল- "এই দেখ আমার গুপ্তধন!" আর সে তার চোখের সামনে সোনালি পোকাটাকে তুলে ধরল।

"আমাকে আগে তুমি বল কোন দেবদূতের মত দয়ালু ধনী ব্যক্তি আমাদেরকে এত টাকা দিলেন?"

"সেটাই তো আমি তোমায় বলতে চাইছি," তার মা হেসে বলল, " আজ দুপুরে এখানে সত্যিই একজন দেবদূর এসেছিলেন, শুধু তাঁকে দেখতে ছিল টাকমাথা পুরোহিতের মত। এই সোনালি পোকাটাই একমাত্র জিনিষ যা উনি আমাকে দিলেন, কিন্তু এর ক্ষমতা হাজার হাজার টাকার থেকে বেশি।

ছেলে পোকাটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল, নিজেই নিজেকে সন্দেহ করল, আর অধৈর্য্যভাবে নিজের সুস্বাদু খাবারের কথা ভাবতে থাকল।"কিন্তু, মা, এই পিতলের খেলনাটার সাথে এই অসাধারণ পোলাও এর সম্পর্ক কি? এত ভাল খাবার যা জীবনে খাইনি?"

"খেলনাই বটে! পিতল! ছিঃ ছিঃ বাছা! তুমি জান না তুমি কি বলছ। শুধু শোন আর এমন এক গল্প শুনবে যা তোমার চোখ খুলে দেবে।"

তার মা তাকে খুলে বলল কি কি হয়েছে, আর গল্পের শেষে, বাকি পড়ে থাকা পোলাও সবটুকু ভুলু আর পুষির জন্য মাটিতে ছড়িয়ে দিল, যেমনটা তার ছেলে আগে কোন দিন করতে দেখেনি, কারণ তারা এতই গরিব ছিল যে পরে খাওয়ার জন্য সবকিছু চেঁছে-পুঁছে জমিয়ে রাখত।

এরপর শুরু হল এক অফুরন্ত সুখের সময়। মা, ছেলে, কুকুর আর বিড়াল - সবাই মনের আনন্দে পেট ভরে খেতে লাগল। সেই ছোট্ট পোকাটাকে দিয়ে তারা আগে কোনদিন না খাওয়া নানারকমের

লোভনীয় খাবার আনাত। মাংসের কালিয়া, বিরিয়ানি, পায়েস আর আরো নানারকমের দারুণ সব খাবার চাইলেই এসে হাজির হত, আর খুব দ্রুত মিং-লির তার সব হারানো শক্তি ফিরে পেল, কিন্তু, মনে হয়, সে একটু অলস হয়ে পড়ল, কারণ তার আর কাজ করার প্রয়োজন ছিল না। আর কুকুর আর বিড়ালটা আরো মোটা হয়ে পড়ল, তাদের গায়ের লোম গুলি লম্বা আর চকচকে হয়ে উঠল।

কিন্তু হায়! যেমন কিনা চীনা প্রবাদে বলে, গর্ব ডেকে নিয়ে আসে দুঃখকে। এই ছোট্ট পরিবার তাদের সৌভাগ্যে এত গর্বিত হয়ে পড়ল যে তারা তাদের বন্ধু এবং আত্মীয়দের ঘনঘন খেতে ডাকতে থাকল নিজেদের ভাল খাবার দেখানোর জন্য। একদিন সুদূর গ্রাম থেকে নিমন্ত্রণ খেতে এল চু পরিবারের কত্তা-গিন্নী। তারা ওয়াংদের বাড়ির অবস্থা দেখে বেশ অবাক হল। তারা ভেবে এসেছিল গরিবের মত খেতে পাবে, কিন্তু তার বদলে পেট পুরে খেয়ে ফিরে গেল।

"এ আমার খাওয়া সেরা ভোজ", নিজেদের ভাঙ্গা বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে চু কত্তা বলল।

"হ্যাঁ, আর আমি জানি ওগুলি কোথা থেকে এসেছে", তার গিন্নী বলল। "আমি দেখেছি বুড়ি ওয়াং তার রান্নার হাঁড়ি থেকে একটা ছোট্ট সোনার গয়না বার করে একটা দেরাজে তুলে রাখল। ওটা নিশ্চয় জাদুর কিছু হবে, কারণ আমি শুনতে পাচ্ছিলাম আগুন উসকাতে উসকাতে ও পোলাও-কালিয়া নিয়ে কি সব যেন বিড়বিড় করছিল।

"একটা জাদু মন্ত্র, অ্যাঁ? সবসময়ে অন্য লোকেরাই সব সৌভাগ্য পায় কেন? মনে হচ্ছে আমাদের সারা জীবন গরীবই থেকে যেতে হবে।"

"এক কাজ কেন করিনা- ওয়াং বুড়ির জাদুমন্ত্রটাকে আমরা কিছুদিনের জন্য ধার নিই না কেন, যদ্দিন না আমাদেরও গায়ে একটু গত্তি লাগে? এ তো কিছু অন্যায় নয়, আর হ্যাঁ, আমরা ওটাকে কিছুদিন পরে ফেরতও দিয়ে দেব।"

"ওরা নিশ্চয় জিনিষটাকে খুব যত্নে রাখে। ওদের এখন কোন কাজ করতে হয়না, তাই ওদের বাড়ি ফাঁকা পাবে কখন? আর ওদের বাড়িতে একটা ঘর, সেটাও আমাদের ঘরের মতই, আর তাই ঐ সোনালি জাদুর জিনিষটাকে খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিণ। কথায় বলে, রাজার ঘরে চুরি করার থেকে ভিখিরির ঘরে চুরি করা বেশি শক্ত।

"আমাদের ভাগ্য আমাদের সহায়," হাত চাপড়ে বলে উঠল চু গিন্নী।" ওরা আজকেই মন্দিরের মেলায় যাচ্ছে। আমি শুনেছি ওয়াং গিন্নী তার ছেলেকে বলছে সে যেন মনে করে তাকে দুপুরবেলা নিয়ে যায়। আমি সেই সময়ে ফিরে গিয়ে ওই জাদুর জিনিষটাকে ওর দেরাজ থেকে বার করে নিয়ে আসব।

"তোমার ভুলুকে ভয় নেই?"

"ধুস্! ও ব্যাটা এত মোটা হয়েছে যে খালি গড়ায়। যদি বুড়ি হটাত করে ফিরে আসে, আমি তাহলে বলব আমি নিজের বড় চুলের কাঁটাটা খুঁজতে এসেছি, যেটা আমি খেতে গিয়ে হারিয়ে ফেলেছিলাম।"

"বেশ ভাল, তাহলে যাও, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা জিনিষটা খালি ধার নিচ্ছি, চুরি করছি না, কারন ওয়াংরা আমাদের ভাল বন্ধু, আর তাছাড়াও, আমরা ওদের বাড়ি থেকে সবে খেয়ে ফিরলাম।"

চু গিন্নী গেল আর এক ঘন্টার মধ্যে বাড়ি ফিরে এসে আনন্দে গদগদ হয়ে তার স্বামীকে সেই পুরোহিতের উফার দেখাল। একটা মানুষও তাকে ওয়াংদের বাড়ি ঢুকতে দেখেনি। কুকুরটা সাড়াশব্দ করেনি, আর বিড়ালটা খালি একবার চোখ খুলে দেখে, বাড়িতে অতিথি দেখে একটু অবাক হয়ে আবার তার দিবানিদ্রায় ফিরে গেছে।

ওদিকে মেলা থেকে ফিরে গরমাগরম খাবার খাবে এই ভেবে এসে, ওয়াং বুড়ি তার জাদুপোকা খুঁজে না পেয়ে মহা কান্নাকাটি জুড়ে দিল। সে সত্যিটা বিশ্বাসই করতে চাইছিল না। সে দেরাজের ভেতরে অন্তত দশবার খুঁজল, আর তারা মায়ে-ছেলেতে মিলে ঘরে ভেতর এমন খোঁজা খুঁজল যে মনে হল ঝড় বোয়ে গেছে।

তারপরে এল ক্ষুধার্ত থাকার দিন, যা আরো কষ্টকর হয়ে উঠল, কারণ তারা এ ক'দিনে ভালমন্দ খেয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আহা, তাদের যদি এহেন অভ্যাস না হত! আবার সেই খুঁটে খুঁটে খাওয়ার দিনে ফিরে যেতে কি কষ্টই না হল।

কিন্তু, ভাল খাবার না পেয়ে, বুড়ি আর তার ছেলের থেকেও বেশি কষ্ট হল পোষ্য দুটির। তাদের অবস্থা আবার আগের মত হল আর রোজ তাদের রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে থাকা হাড়গোড় খুঁজতে হত, যাঅন্য বড়লোকের বাড়ির কুকুর বিড়ালেরা ছুঁয়েও দেখত না।

এরকম কিছুদিন চলার পরে, একদিন পুষি হটাত উত্তেজনায় ফোঁসফোঁস করে উঠল।

"তোর হলটা কি?" ধমক দিল ভুলু।" তুই কি খিদেয় পাগল হলি, নাকি আবার এটা মাছি ধরেছিস?"

"আমি আমাদের দুরবস্থার কথা ভাবছিলাম, আর এখন আমি বুঝতে পারছি সব সমস্যার কারণ কি।"

"তুই জানিস?" বিদ্রুপের সুরে বলল ভুলু।

"হ্যাঁ, আমি জানি, আর তুই আমাকে তাচ্ছিল্য করার আগে দু'বার ভাব, কারণ তোর ভবিষ্যত আমার হাতের মুঠোয়, সেটা তুই কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারবি।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, শুধুমুধু রাগ করিস না। কি এবন অসাধারণ আবিষ্কার তুই করেছিস - যে সব ইঁদুরদের একটা করে লেজ আছে?"

"সবার আগে বল, তুই কি আমাদের পরিবারের সৌভাগ্য ফিরিয়ে আনতে আমাকে সাহায্য করতে চাস?"

"অবশ্যই চাই। বোকার মত কথা বলিস না, " আবার ভালমন্দ খাওয়ার আশায় কুকুরটা লেজ নেড়ে ডেকে উঠল। "নিশ্চয়! নিশ্চয়! যদি তুমি ভাগ্যদেবীকে ফিরিয়ে আনতে পারিস, তাহলে তুই যা বলবি সব করব।"

"ঠিক আছে। তাহলে শোন। আমাদের বাড়িতে চোর ঢুকে গিন্নীর সোনালি পোকাটাকে চুরি করেছে। তোর মনে আছে আমরা কিরকম ভালমন্দ খাবার পেতাম হাঁড়ির থেকে। শোন তাহলে, প্রতি দিন আমি দেখতাম আমাদের গিন্নী ওই দেরাজ থেকে একটা ছোট্ট সোনালি পোকা বার করে হাঁড়িতে ফেলত। একদিন আমার সামনে সেটাকে তুলে ধরে বলেছিল, 'দেখ পুষি, এইটাই আমাদের সব আনন্দের মূলে। তুই নিশ্চই ভাবছিস এটা তোর হলে কেমন হত?' এই বলে হেসে আবার সেটাকে দেরাজে ঢুকিয়ে

রাখল।"

"সত্যি বলছিস?" জিজ্ঞাসা করল ভুলু।"কই আমাকে তো এর আগে এটা নিয়ে আমাকে কিছু বলিস নি।

" তোর মনে আছে যেদিন চু কত্তা আর চু গিন্নী এখানে এসেছিল, আর কিভাবে চু গিন্নী আবার ফিরে এসেছিল যখন আমাদের গিন্নীমা আর দাদাবাবু মেলায় গেছিল? আমি ওকে দেখেছিলাম, চোখের কোণ দিয়ে। আমার একটু অবাক লেগেছিল, কিন্তু আমি স্বপ্নেও ভাবিনি ও চোর হবে। হায়! আমি কি ভুল করেছিলাম। ও পোকাটাকে নিয়ে চলে গেল, আর আমি যদি ভুল না করি, এখন ওরা সেইসব ভালমন্দ খাচ্ছে যা আসলে আমাদের।"

" এখনি ওদের ধরি চল," দাঁত কিড়মিড় করে গর্জে উঠল ভুলু।

"সেটা করে লাভ নেই, " পুষি বলল, " কারণ শেষ অবধি ওরাই জিতে যাবে। আমাদের ওই পোকাটাকে দরকার- সেটাই আসল। প্রতিশোধ নিতে হলে মানুষেরা নিক; ওতে আমাদের কোন কাজ নেই।"

"তুই কি করতে বলিস?" ভুলু বলল।" আমি তোর সাথে সবসময়ে আছি।"

"চল আমরা চু দের বাড়িতে গিয়ে পোকাটাকে নিয়ে পালিয়ে আসি।"

"হায়রে, আমি তো বিড়াল নই!" মনের দুঃখে বলল ভুলু। " আমরা ওখাণে গেলে আমি ভেতরে ঢুকতে পারব না, কারণ চোরেরা সব সময়ে তাদের দরজা ভাল করে এঁটে রাখে। তোর মত হলে আমি দেওয়ালে চড়তে পারতাম। জীবনে এই প্রথমবার আমি একটা বিড়ালকে হিংসা করছি।"

"আমরা একসঙ্গে যাব, " বলল পুষি, " নদী পেরোবার সময়ে আমি তোর পিঠে চেপে যাব, আর তুই আমাকে অজানা প্রাণীদের হাত থেকে রখা করবি। যখন আমরা চু দের বাড়িতে পৌঁছাব, আমি দেওয়ালে চড়ে যাব, আর বাকি কাজটা নিজে করব। শুধু তোকে বাইরে অপেক্ষা করতে হবে যাতে আরা পোকাটাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারি।"

কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে গেল। দুই সঙ্গীতে মিলে সেই রাতেই অভিযানে বেরোল। পুষির বুদ্ধিমত তারা নদী পেরোল, আর ভুলু সাঁতার কেটে বেশ মজা পেল, কারণ, সে জানাল, তার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। আর পুষির গায়ে এক ফোঁটাও জল লাগল না। মাঝরাতে তারা চু দের বাড়ি পৌঁছাল।

"আমার আসা অবধি অপেক্ষা কর," ভুলুর কানে ফিসফিস করে বলল পুষি।

সজোরে এক লাফ দিয়ে সে মাটির দেওয়ালের ওপরে উঠে পড়ল, আর তারপরে এক লাফে ভেতরের উঠোনে। ছায়ায় দাঁড়িয়ে সে ঠিক করতে লাগল কিভাবে কি করবে, এমন সময়ে অল্প একটু সড়সড় আওয়াজ আর ব্যস! এক বিশাল লাফ দিয়ে, থাবা বাগিয়ে, সে একটা ইঁদুরকে ধরে ফেলল, যে কিনা সবে তার গর্ত থেকে মাঝরাতে একটু হাওয়া খেতে বেরিয়েছিল।

এখন, পুষির এতই খিদে পেয়েছিল, যে সে এই লোভনীয় শিকারকে এখনি কপাত করে গিলে ফেলত, যদি না ইঁদুরটা মুখ খুলে, তাকে অবাক করে দিয়ে, বিড়ালদের ভাষায় কথা বলতে শুরু করত।

" ভাল পুষি, রক্ষে কর, তোমার দাঁত বসিও না! নখ গুলিকে আমার থেকে একটু দূরে রাখ। তুমি কি জাননা এখন নিয়ম হয়েছে বন্দীদের সম্মান জানানোর? আমি কথা দিচ্ছি আমি পালাব না।"

"যাঃ! ইঁদুরের আবার সম্মান কিসের র‍্যা?"

" এটা ঠিক, যে বেশিরভাগেরই নেই, কিন্তু আমার পরিবার কিনা বেড়ে উঠেছে কনফুসিয়াসের (প্রাচীন চীনের দার্শনিক) ছাদের তলায়, আর সেখানে আমাদের এত জ্ঞান লাভ হয়েছে যে আমরা হলুম গিয়ে নিয়মের মধ্যে ব্যতিক্রম।তুমি যদি আমাকে ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে সারা জীবন মেনে চলব, আমি তোমার দাস হয়ে থাকব। " তারপরে, দ্রুত এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে বলল, "দেখ, আমি ছাড়া পেয়ে গেছি, কিন্তু আমার আত্মসম্মান আমাকে এখানে ধরে রেখেছে, তাই আমি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব না।"

"না করলেই ভাল," নিজের শরীরে মোচড় দিয়ে বলল পুষি, জিভ তার ইঁদুরের মাংসের লোভে লকলক করছে। "আমার এখন তোকে কিছু প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করছে। প্রথমে, আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দে, আর আমি দেখি তুই সত্যি কথা বলিস কিনা। তোর কত্তা গিন্নী আজকাল কেমন খাবার খাচ্ছে, যে তুই এত মোটাসোটা গোলগাল, আর আমি রোগা শুঁটকে?"

"ওহ, আমাদের এখন ভাগ্য খুব ভাল বলতে হবে। কত্তা-গিন্নী সারা দেশের সব থেকে ভাল ভাল খাবার খাচ্ছে, আর আমরা তার থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে পাচ্ছি বইকি।"

"কিন্তু এটা একটা পুরোনো ভাঙ্গাচোরা বাড়ি। ওরা কি করে ভাল খাবার পেতে পারে?"

"সে এক বড় রহস্য, কিন্তু আমি তোমাকে সত্যি কথা বলতে বাধ্য, তাই বলছি। আমাদের গিন্নী কোনরকমভাবে একটা মন্ত্রপূত জিনিষ পেয়েছে..."

"সে আমাদের বাড়ি থেকে ওটা চুরি করেছে," ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল পুষি, " আমি ওকে বাগে পেলে ওর চোখ খুবলে ফেলব। আমরা ওই পোকাটাকে ছাড়া না খেয়ে মরতে বসেছি। আর তোর গিন্নী আমাদের বাড়ি নেমন্তন্ন খেয়ে এসেই ওটা চুরি করেছে! এই বিষয়ে তোর কি বলার আছে রে ইঁদুর ব্যাটা? তোর মনিবের পূর্বপুরুষেরাও কি সেই মহাত্মার কথা শুনে চলত?"

"ওহ ওহ ওহ! এতদিনে বুঝলাম!" ইঁদুর চেঁচিয়ে বলল, "আমি অনেকবার ভেবেছি ওরা ওই সোনালি পোকাটাকে কোথায় পেল, যদিও আমি প্রশ্ন করার সাহস পাইনি।"

"সে বেশ করেছিস! কিন্তু এখন শোন, ইঁদুর-বন্ধু - তুই আমাকে সোনালি পোকাটাকে এনে দিবি, আর আমি তোকে নিঃশর্তে ছেড়ে দেব। তুই জানিস, ওটাকে কোথায় লুকিয়ে রাখে?"

"হ্যাঁ, ভাঙ্গা দেওয়ালের গায়ে একটা ফাটলের মধ্যে। আমি সেটাকে এক মূহুর্তের মধ্যে তোমার কাছে নিয়ে আসতে পারি, কিন্তু আমাদের কাছ থেকে ওটা চলে গেলে আমরা বেঁচে থাকব কি করে? আবার খাবারের অভাব হবে, আবার আমাদের ভাগ্যে জুটবে ভিখিরির খাদ্য।"

"নিজের ভাল কাজের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকিস", গরগর করে বলল পুষি। "বুঝলি, একজন সৎ ভিখিরি হয়ে থাকা দারুণ ব্যাপার। এখন যাঃ! আমি তোকে বিশ্বাস করছি কারণ তোরা কনফুসিয়াসের বাড়িতে থাকতিস। আমি এখানে তোর ফেরার জন্য অপেক্ষা করব। আহা!" সে নিজের মনে হাসল,"

ভাগ্যদেবী মনে হচ্ছে সদয় হচ্ছেন।"

পাঁচ মিনিট পরে ইঁদুরটা বেরিয়ে এল, পোকাটাকে মুখে নিয়ে। সে বিড়ালটার দিকে পোকাটাকে এগিয়ে দিল, আর দিয়েই এক দৌড়ে পালাল। তার সম্মান রক্ষা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সে পুষিকে ভয় পেয়েছিল। সে পুষির সবুজ চোখে লোভ দেখেছিল, আর সে বিড়াল তার কথা রাখত কিনা সন্দেহ আছে, যদি না তার বাড়ি ফিরে যাওয়ার অত তাড়াহুড়ো থাকত, যেখানে গেলে তার মনিব গিন্নী আবার দারুণ খাবার আনার জন্য হাঁড়িটাকে বলতে পারবে।

পূব্দিকের পাহাড়ের কোলে যখন সূর্য উদয় হচ্ছিল, তখন দুই অভিযাত্রী নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছাল।

"সাবধান," বলল ভুলু, যখন বিড়ালটা তার পিঠে লাফ দিয়ে উঠল, নদী পার হবে বলে, "সাবধান, জাদু জিনিষটা ভুলে যাসনা। মোদ্দা কথা, মনে রাখিস, যদিও তুই একটা মেয়ে, কিন্তু ওপারে পৌঁছান অবধি তোর মুখ বন্ধ রাখা দরকার।"

"ধন্যবাদ, আমার মনে হয়না আমার তোর উপদেশের প্রয়োজন হবে," পুষি জবাব দিল, মুখে পোকাটাকে তুলে নিয়ে ভুলুর পিঠে লাফ দিয়ে উঠতে উঠতে।

কিন্তু হায়! ঠিক যখন তারা অন্যদিকের পাড়ের কাছে এসে পৌঁছেছে, উত্তেজিত বিড়ালটার বুদ্ধি লুপ্ত হল। একটা মাছ হটাত করে ওর নাকের ঠিক নিচ দিয়ে লাফ দিল। সেই লোভ সামলানো মুশকিল। তার চোয়াল দুটি নিমেষে হাঁ হল মাছটাকে ধরার জন্য, আর তার ফলে সোনালি পোকাটা নদীর তলায় ডুবে গেল।

"হল তো!" কুকুরটা রেগে বলল, " তোকে আমি কি বলেছিলাম? এক কষ্ট সব জলে গেল - তোর বোকামোর জন্য।"

কিছুক্ষণের জন্য খুব বাজে ঝগড়া হল, আর দুই সঙ্গীতে মিলে একে অপরকে অনেক বাজে কথা বলল। তারপরে ঠিক যখন তারা নদীর পাড় ছেড়ে চলে যাচ্ছে, হতাশ এবং নিরাশ হয়ে, একটা ব্যাং, যে কিনা তাদের কথা শুনতে পেয়েছিল, এসে বলল যে সে নদীর তলার থেকে পোকাটাকে খুঁজে এনে দেবে। সে পোকাটাকে খুঁজে এনে দিলে, দুজনে মিলে তাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ির পথে হাঁটা দিল।

যখন তারা বাড়ি পৌঁছাল, তারা দেখল দরজা বন্ধ আছে। ভুলু অনেক করে ডাকাডাকি করল, যাতে মনিব দরজাটা খুলে দেয়, কিন্তু দরজা খুলল না। ভেতর থেকে জোরে কান্নাকাটির শব্দ ভেসে আসছিল।

"গিন্নীমার মন খারাপ", পুষি ফিসফিস করে বলল।" আমি গিয়ে ওনাকে খুশি করে দেব।"

এই বলে, সে এক লাফে জানালার একটা ফুটো দিয়ে ভেতরে লাফ দিল। কিন্তু হায়! সেই ফুটো মাটির থেকে অনেক উঁচুতে ছিল আর অনেক ছোটও ছিল, তাই বিশ্বাসী ভুলু ঢুকতে পারল না।

পুষি ভেতরে ঢুকে দেখল, বিছানায় বুড়ির ছেলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, ক্ষুধায় কাতর হয়ে, আর তার মা, হতাশ হয়ে বসে মাথা ঝাঁকাচ্ছে, তার কুঁচকে যাওয়া হাত দুটো কচলাচ্ছে, আর জোরে জোরে কেঁদে ডাকছে যাতে তাদের কেউ এসে সাহায্য করে।

"আমি এসে গেছি, গিন্নীমা, " বলল পুষি, " আর এই তোমার সেই জিনিষ যার জন্য তুলি কাঁদছ। আমি এটাকে উদ্ধার করে তোমার কাছে নিয়ে এসেছি।"

পোকাটাকে দেখে বুড়ি এতই খুশি হল যে বিড়ালটাকে তার কোলে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরল।

"জলখাবার, বাছা, জলখাবার! জেগে ওঠ বাছা! ভাগ্য আবার ফিরে এসেছে। আমাদের আর না খেয়ে থাকতে হবে না।"

একটু পরেই একটা দারুণ গরম ধোঁয়াওঠা খাবার তৈরি হয়ে গেল। আর তুমি বুঝতেই পারছ, কিভাবে বুড়ি আর তার ছেলে, পুষির প্রশংসা করতে করতে, তার থালায় ভাল ভাল খাবার ভরে দিল, কিন্তু কুকুরটার সম্পর্কে কিছুই বলল না, কারণ এই পুরো সময়েটাতে চালাক বিড়াল এই সোনালি পোকা উদ্ধারের ব্যাপারে ভুলুর ভূমিকা নিয়ে একটাও কথা বলেনি। সে বেচারা দুঃখে অবাক হয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে ভাল ভাল খাবারের গন্ধ শুঁকতে লাগল।

অবশেষে, যখন জলখাবার খাওয়া শেষ হল, তখন পুষি আবার জানালার গর্ত দিয়ে বেরিয়ে এল।

"ওরে ভুলুরে, " সে হেসে হেসে বলল, " তোর ভেতরে এসে দেখা উচিত ছিল আমাকে ওরা কত কি খাওয়াল! আমি পোকাটা ফিরিয়ে নিয়ে আসায় গিন্নীমা এত খুশি হয়েছে যে আমাকে খেতে দিয়ে দিয়ে আর আমার সম্পর্কে ভাল ভাল কথা বলে আর শেষ করতে পারে না। সত্যি রে, তুই একটুও পেলিনা, আর এখনো না খেয়ে আছিস। তুই বরং রাস্তায় গয়ে দেখ হাড়গোড় কিছু পাস কিনা।"

এই লজ্জাজনক বিশ্বাসঘাতকতা দেখে ভুলু এত রেগে গেল যে, রেগে গিয়ে সে বিড়ালটার ওপরে লাফিয়ে পড়ল, আর কয়েক মূহুর্তের মধ্যে তাকে মেরে ফেলল।

"যে একজন বন্ধুকে ভুলে যায়, আর নিজের কথার দাম রাখে না, তাকে এভাবেই মরতে হয়," সে চিৎকার করে বলল।

দৌড়ে রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে, সে অন্যান্য কুকুরদের কাছে পুষির বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলল, আর সবাইকে সাবধান করে দিল যেন তারা বিড়ালদের সাথে কখনই বন্ধুত্ব না পাতায়।

আর এই কারণেই, ভুলুর বংশধরেরা, সে চীনেই হোক, বা অন্যান্য দেশে, সর্বদা পুষির বংশধরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। তারা কখনই আর একে অপরে সাথে বন্ধুত্ব পাতায় না।

চীন দেশের রূপকথা
নর্ম্যান হাইন্সডেল পিটম্যান

অনুবাদঃ
মহাশ্বেতা রায়
পাটুলি, কলকাতা

পড়ে পাওয়া: বুড়ো আংলার সন্ধানে

চঞ্চলকুমারের ঠাকুমা উঠতে বসতে বলেন, " আমার এই একাত্তর বছর বয়সে চঞ্চলের মত দুষ্টু ছেলে দুটো দেখিনি। ঠিক রিদয়ের মত।" চঞ্চলকুমার পড়তে বসলে হাই তোলে। পরীক্ষায় দশটার মধ্যে দশটা অঙ্ক ভুল করে। চঞ্চলকুমারের এগারো বছর বয়স হল কিন্তু একপাতা বাংলা পড়তে তিনবার হোঁচট খায়। এদিকে দুষ্টু বুদ্ধিতে ওস্তাদ। রাস্তায় ঘুমন্ত নেড়িকুকুরের কানের মধ্যে কাকের পালক দিয়ে সুড়সুড়ি দিয়ে এক বিরাট কান্ড ঘটিয়েছিল। কুকুরটা ঘুম ভেঙ্গে রাগে গড়গড় করে রাস্তার লোককে তাড়া করেছিল। একদিন মাস্টারমশাই এর জুতোর মধ্যে লাল পিঁপড়ে ভরে দিয়ে শান্ত সুবোধ বালকের মত পড়তে বসেছিল।

এই চঞ্চলকুমার এক ছুটির দিন দুপুরবেলা ঠাকুমার ঘরের তাক থেকে তাড়াহুড়ো করে আমসত্বের কৌটোটা নামাচ্ছিল। কৌটোর পাশে রাখা পোড়া মাটির কাজ করা গণেশের মূর্তিটা ধপ্ করে মাটিতে পড়ে চার টুকরো হয়ে গেল। সেই শব্দে চঞ্চলের ঠাকুমার দিবানিদ্রা ছুটে গেল। অসময়ে ঘুম ভেঙ্গে ঠাকুমা বিরক্তিতে চোখ খুলে বললেন, "চঞ্চলকুমার, কিসের শব্দ হল? এই ভরদুপুরে কি অপকান্ড করা হল?"

চঞ্চল ঘাপটি মেরে ছিল দেখে ঠাকুমা উঠে পড়লেন। মেঝেরে ভাঙা গণেশ ঠাকুরের টুকরো গুলো দেখে

কপালে চোখ তুলে বললেন,

"এ কি কান্ড করলি, চঞ্চল? গণেশঠাকুর ভাঙলি? গণেশঠাকুর রেগে গেলে তোর ঠিক রিদয়ের মত অবস্থা হবে।"

কি কান্ড! চঞ্চলকুমারের ওপর কি গণেশঠাকুর সত্যি সত্যি রেগে গেলেন? আর চঞ্চলের অবস্থা কি রিদয়ের মত হয়ে গেল? এই গল্পটা আর আরো এরকম মন ভোলানো গল্প পড়তে হলে যোগাড় করে ফেল শিবানী রায়চৌধুরীর লেখা বই -'বুড়ো আংলার সন্ধানে'

বুড়ো আংলার সন্ধানে
শিবানী রায়চৌধুরী
লালমাটি
মূল্যঃ ৮০ টাকা

পুরাণকথা: কি করে রাত্রি এল

সেই অনেক, অনেক দিন আগে, যখন সময়ের হিসাব ছিল না, যখন পৃথিবী সবে সৃষ্টি হয়েছে, তখন রাত ছিল না। সবসময়েই দিন থাকত। কেউই তখন সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের কথা শোনেনি, তারার আলো বা চাঁদের কিরণ কাকে বলে জানত না। ছিল না কোন রাতের পাখি, রাতের পশু, রাতের পোকা, বা রাতের ফুল। ছিল না কোন লম্বা ছায়া, বা ফুলের সুগন্ধে ভরা রাতের শীতল বাতাস।

সেই সব দিনে, সমুদ্রের গভীর অতলে বসবাসকারী বিরাট সর্পরাজের মেয়ে, বিয়ে করলেন মাটির দেশে রাস্ত্বকারী মানুষদের এক ছেলেকে। তিনি অতল জলের তলায় ছায়ায় ঘেরা তাঁর বাড়ি ছেড়ে দিনের আলোয় ভরপুর দেশে তাঁর স্বামীর সঙ্গে থাকতে এলেন। উজ্জ্বল দিনের আলোয় থেকে থেকে তাঁর চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়ল, তাঁর রূপ ফ্যাকাশে হতে থাকল। তাঁর স্বামী দুঃখভরা চোখে তাঁর দিকে দেখতেন, কিন্তু তিনি বুঝে উঠতে পারতেন না কিভাবে স্ত্রীকে সাহায্য করবেন।

"ওহ, যদি রাত আসত..." তাঁর স্ত্রী খাটে শুয়ে ক্লান্ত ভাবে এপাশ-ওপাশ করতে করতে বললেন।" এখানে সবসময়ে দিন, কিন্তু আমার বাবার রাজত্বে কত ছায়া। আহা, আমি যদি একটুও রাত্রির ছায়া পেতাম!"

তাঁর স্বামী তাঁর কথা শুনতে পেলেন।" রাত্রি কি?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।"আমাকে বল রাত্রি কি তাহলে নাহয় আমি তোমার জন্য একটু আনানোর চেষ্টা করতে পারি।"

"রাত্রি", বললেন সর্পরাজের মেয়ে,"হল সেই সব গভীর ছায়ার নাম যা সমুদ্রের অতলে আমার বাবার রাজত্বকে আঁধারে ঢেকে রাখে। আমি তোমাদের মাটির দেশের সূর্যকিরণ ভালোবাসি, কিন্তু এত আলোতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি। যদি আমার বাবার রাজত্বের ছায়ার কিছুটা অংশও পেতাম আমার ক্লান্ত চোখ গুলিকে স্বস্তি দেওয়ার জন্য।"

তাঁর স্বামী সেই শুনেই নিজের তিনজন সবথেকে অনুগত ক্রীতদাসকে ডেকে পাঠালেন। " আমি তোমাদেরকে এক যাত্রায় পাঠাব," তিনি তাদের বললেন, " তোমাদের যেতে হবে বিরাট সর্পরাজের রাজত্বে, গভীর সমুদ্রের নিচে, আর ওঁকে বলতে হবে তোমাদেরকে কিছুটা রাত্রির অন্ধকার দিতে যাতে ওঁর মেয়ে আমাদের মাটির দেশে সূর্যের আলোর প্রকোপে মারা না যান।"

সেই তিন জন ক্রীতদাস বিরাট সর্পরাজের রাজত্বের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করল। অনেক বাধা বিপত্তি পেরিয়ে, অনেক দিন পরে তারা গিয়ে পৌঁছাল গভীর সমুদ্রের নিচে তাঁর বাড়িতে, আর তাঁকে অনুরোধ জানাল কিছুটা রাত্রির ছায়া দিতে যাতে তারা মাটির দেশে নিয়ে যেতে পারে। বিরাট সর্পরাজ তক্ষুণি তাদেরকে এক বিরাট বস্তা ভর্তি করে দিলেন। সেটা শক্ত করে আটকানো ছিল, আর বিরাট সর্পরাজ তাদেরকে সতর্ক করে দিলেন যেন তারা সেই বস্তাটিকে ততক্ষণ না খোলে, যতক্ষণ না তারা তাঁর মেয়ের কাছে পৌঁছাচ্ছে।

তিনজন ক্রীতদাস ফিরে চলল, তাদের মাথায় সেই বিরাট বস্তা যার মধ্যে রাত্রি বাঁধা আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা বস্তার ভেতর থেকে নানাধরণের শব্দ শুনতে পেল। সেই শব্দগুলি ছিল রাতের পশু, রাতের পাখি আর রাতের পোকাদের। তুমি যদি কোন-দিন নদীর ধারে জঙ্গলের মধ্যে রাতের প্রাণীদের সমবেত আওয়াজ শুনে থাক, তাহলে বুঝতে পারবে সেই শব্দ কেমন ছিল। সেই তিনজন ক্রীতদাস এরকম ধরণের শব্দ কোনদিন শোনেনি। তারা খুব ভয় পেয়ে গেল।

"চল আমরা এই রাত্রি ভর্তি ব্যাগটাকে এইখানেই ফেলে রেখে যত জোরে পারি দৌড়ে পালাই," প্রথম জন বলল।

"আমরা মরব। যাই করি না কেন, আমরা মরবই," দ্বিতীয় জন বলল।

"আমরা মরি বা বাঁচি, আমি এখন ওই বস্তাটাকে খুলে দেখব এইসব ভয়ানক শব্দ কারা করছে," বলল তৃতীয় কৃতদাস।

এই কথার পরে তারা সেই বস্তাটাকে মাটিতে রেখে তার মুখ খুলে ফেলল। অমনি বেরিয়ে এল রাতের পশু, রাতের পাখি আর রাতের পোকারা আর তার সাথে বেরিয়ে এল রাতের কালো আঁধার। সেই দেখে ক্রীতদাসেরা খুব ভয় পেয়ে দৌড়ে জঙ্গলে পালিয়ে গেল।

ওদিকে তো সর্পরাজের কন্যা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন কখন কৃতদাসেরা ফিরবে বস্তা ভর্তি রাত্রি নিয়ে। যবে থেকে তারা যাত্রা শুরু করেছে, তিনি তাদের অপেক্ষায় রয়েছেন, হাত দিয়ে নিজের চোখকে ছায়া দিচ্ছেন আর দূর প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে আছেন, এই আশায় যে তারা দ্রুত ফিরে আসবে। তিনি এইরকম ভাবে এক রাজকীয় তাল গাছে নিচে দাঁড়িয়ে ছিলেন, যখন সেই তিনজন কৃতদাস বস্তার মুখ খুলে রাত্রিকে বেরিয়ে আসতে দিয়েছিল। তিনি দূর দিগন্তে রাতের আঁধার দেখতে পেলেন আর আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন- "রাত্রি আসছে, অবশেষে রাত্রি আসছে।" তারপরে তিনি চোখ বুজে সে গাছের নিচে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঘুম যখন ভাঙল তখন তাঁর শরীর খুব ভাল লাগল। তিনি ঠিক সেই আগের মত প্রাণোচ্ছল রাজকন্যা হয়ে গেলেন যিনি সমুদ্রের তলায় বাবার রজত্ব ছেড়ে মাটির দেশে এসেছিলেন। তিনি এখন দিনকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত। তিনি রাজকীয় তাল গাছের মাথায় সে ঝকঝকে তারাটা জ্বলজ্বল করছিল, তাকে বললেন,"ও ঝকঝকে, সুন্দর তারা, এর পর থেকে তোমাকে সবাই চিনবে ভোরের

তারা বলে আর তুমিই দিন শুরু হওয়ার বার্তা দেবে। এই সময়ে তুমিই হবে আকাশের রানী।"

তারপর তিনি সমস্ত পাখিদের ডেকে বললেন, "ও আমার সুন্দর গান গাওয়া পাখির দল, এর পর থেকে তোমরা এই সময়ে দিনের আগমন ঘোষণা করে সবথেকে সুন্দর, মিষ্টি গান গাইবে।" তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল মোরগ। তাকে ডেকে তিনি বল্লেন, "তুমি হলে রাতের পাহারাদার। তোমার ডাক শুনেই সবাই বুঝতে পারবে রাত শেষ হয়েছে আর দিন আসছে।" সেই থেকে রাত পোহালে মোরগ ডাক দিয়ে দিনের আগমণ ঘোষণা করে। অপেক্ষমাণ পাখিরা সেই শুনে মিষ্টি সুরে গান গায় আর ভোরের তারা আকাশে রাজত্ব করে।

ওদিকে দিনের আলো ফেরার পরে ওই তিনজন কৃতদাস খালি বস্তা নিয়ে চুপিচুপি জঙ্গল থেকে বাড়ি ফিরে এল।

"অবিশ্বাসী কৃতদাসের দল, " তাদের মনিব বললেন, " তোমরা কেন বিরাট সর্পরাজের কথা মেনে চলনি আর বস্তাটা কেবলমাত্র তাঁর কন্যার সামনে খোলনি? যেহেতু তোমরা অবাধ্য হয়েছ, তাই আমি তোমাদের বাঁদরে পরিবর্তিত করব। এর পরথেকে তোমরা গাছে থাকবে। তোমাদের ঠোঁটে সবসময়ে বস্তার মুখ বন্ধ করা মোমের দাগের মত দাগ থাকবে।"

এইজন্যই আজকের দিকেও বাঁদরদের ঠোঁটের ওপর সেইরকম দাগ দেখতে পাওয়া যায়, যে ঠোঁট ব্যবহার করে তারা বস্তার মুখ আটকানো মোমের প্রলেপ কামড়ে খুলেছিল; আর ব্রাজিলে রাত ঠিক সেইভাবেই দিনের ওপর দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠিক সেই অনেকদিন আগে যেরকম ভাবে বস্তার মধ্যে থেকে বেরিয়েছিল। আর সেইসময়ে, সমস্ত রাতের পশু, রাতের পাখি আর রাতের পোকারা একসঙ্গে কলধ্বনি করে ওঠে।

ব্রাজিলের উপকথা
অনুবাদঃ
মহাশ্বেতা রায়
পাটুলি, কলকাতা

স্বাধীনতার গল্পঃ পর্ব ৫

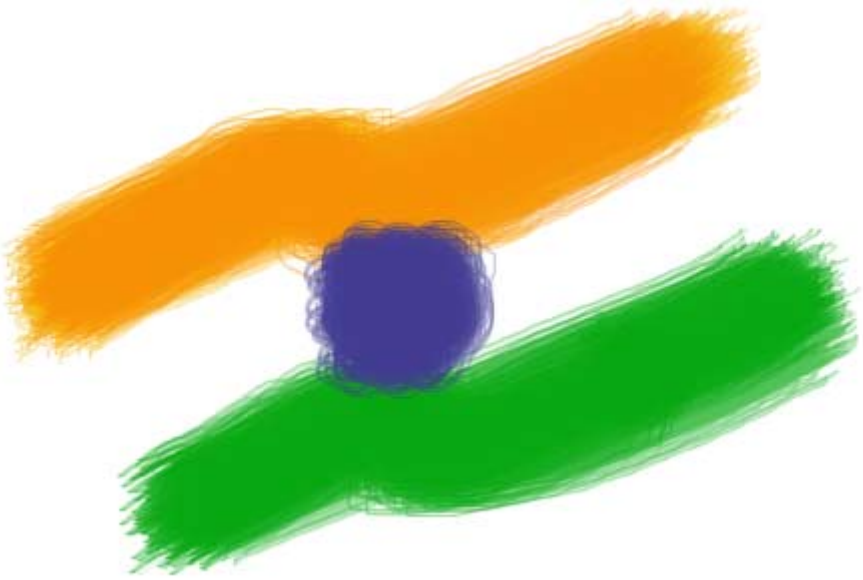

উরিব্বাস, কি বৃষ্টি, কি বৃষ্টি!!!! থামতেই চায় না। চারিদিক টইটম্বুর। এমন বৃষ্টি আগে কোনোদিন দেখেছি কি না মনে পড়ছে না। তবে আমদের স্বাভাবিক জীবনের গতি কিন্তু স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের হাউসিং কমপ্লেক্স এ বেশ হাঁটুর কাছাকাছি জল। দেখি, তোমার বয়েসি সবাই বেশ সেখানে সাঁতরানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মনে পড়ে গেল আমার ছোটোবেলার কথা, উঠোনে নৌকা ভাসানোর কথা – যে নৌকার সাথে ভেসে যেত আমাদের স্বপ্ন। জানি না, তোমার সেই নৌকায় ওঠার সময় আছে কি না।

বাস্তবের সঙ্গে আমাদের মানসচক্ষের অপূর্ব মিলনে তৈরী হয় ইতিহাস। তবেই টান তৈরী হয় অতীতের দিকে। চলো, সেই উলটো টানেই তোমাকে নিয়ে ভেসে পড়ি।

পাশ্চাত্য সম্পর্কে আমরা মনের কোণে সব সময় একটা উচ্চ ধারণা পোষণ করি। কিন্তু জানলে অবাক হবে যে অষ্টাদশ শতাব্দী-তে বৃটেনের কৃষি ব্যবস্থা ভারতের থেকে কোনো অবস্থাতেই উন্নত ছিল না। শিল্পও ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পরে বাংলায় ক্ষমতা লাভ ইংরেজ বণিকদের সামনে ধনরত্ন ও পুঁজি সংগ্রহের এক বিরাট সম্ভাবনার দরজা খুলে দিল। এ তো ছিল ক্ষমতালাভের বাইরে না চাইতেই জল। ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় দেওয়ানি লাভ করল। পুঁজি সংগ্রহের মাত্রা ছাড়িয়ে লুঠতরাজ চলতে লাগল। বাধা দেওয়ার কেউ ছিল না। ছলে বলে কৌশলে কোম্পানি বাংলার মানুষের কাছ থেকে বর্ধিত হারে খাজনা আদায় করতে লাগল। বেশ মজার রাজত্ব – শাসনের কোনো দায়িত্ব নেই অথচ বাঁধনছাড়া অর্থাগম। বাংলার রাজস্ব থেকে আদায় হতে থাকল বিপুল পরিমাণ অর্থ। সেই অর্থ ইংরেজ বণিকরা ব্যবসার কাজে তো লাগাতই। সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রসারের জন্য নিজেদের সামরিক শক্তির বৃদ্ধির কাজেও লাগাত। আর এভাবে যে সম্পদ তারা বাংলার বুক থেকে লুঠ করত, তা পন্যের আকারে নিজেদের দেশে চালান দিত। কোম্পানির কর্মচারীরা বে-আইনি ভাবে ব্যক্তিগত ব্যবসা করে অনেক টাকা উপার্জন করে তা বিলেতে পাচার করত। ভাবতে পার, অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৃটেনের জাতীয় আয়ের দুই শতাংশ ছিল শুধুমাত্র বাংলা ও ভারতের অন্যান্য জায়গা থেকে লুঠ করা

সম্পদ।

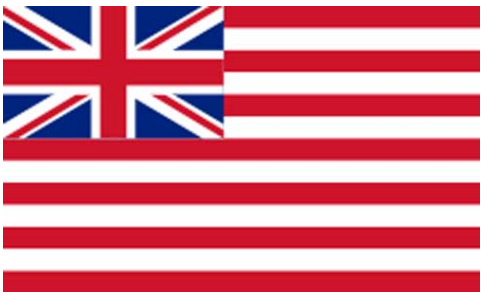

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পতাকা

একটা আর্থিক হিসেবের খসড়া দিলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হবে। কোম্পানি বাংলায় একচ্ছত্র দেওয়ানি লাভের আগে, নবাবী আমলে, ১৭৬৪-৬৫ সালে, বাংলায় রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ ১৭ হাজার পাউন্ড। কোম্পানী দেওয়ানী লাভের পরেই প্রথম বছরে ১৭৬৫-৬৬ সালে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ১৪ লক্ষ ৭০ হাজার পাউন্ড। এ ভাবে প্রতি বছরেই আয় বাড়তে বাড়তে ১৭৭১-৭২ সালে তার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ২৩ লক্ষ ৪১ হাজার পাউন্ড। আর ১৭৭৫-৭৬ সালের হিসেব অনুযায়ী এই হিসেব গিয়ে দাঁড়ায় ২৮ লক্ষ ১৮ হাজার পাউন্ডে। লর্ড কর্নওয়ালিশ যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন (১৭৯০ সাল) তখন বার্ষিক রাজস্বের স্থায়ী পরিমাণ নির্দিষ্ট করেন, ৩৪ লক্ষ পাউন্ড। এই অর্থ আদায় করা হত দরিদ্র কৃষকদের রক্ত শোষণ করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ইংল্যান্ডে একটার পর একটা আবিষ্কার হতে থাকল। জন্ম নিল নতুন নতুন প্রযুক্তি। ঘটে গেল শিল্পবিপ্লব। কিন্তু সেই বিপ্লবের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে প্রয়োজন শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল। ইংরেজরা ভারত থেকে লুন্ঠিত সম্পদ ও জবরদস্তি করে অল্পমূল্যে কেনা সামগ্রী দিয়ে তা সরবরাহ করতে থাকল। কিন্তু শুধু উৎপাদন করলেই তো আর চলবে না। উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রির জন্য বাজার চাই। ভারত ছিল কাচাঁমাল ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনের দিক থেকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ। কিন্তু নিজেদের বাজার তৈরী করার জন্য ইংরেজ বণিক, শাসক-রা সব দিল ধ্বংস করে। বাংলার বস্ত্রশিল্পের তখন ছিল ভুবন-জোড়া খ্যাতি। ইংরেজরা তাই প্রথমেই থাবা বসাল বাংলার বিখ্যাত তাঁত শিল্পে।

ভুবনবিখ্যাত বাংলার তাঁতের কাপড়

ইংরেজ লুন্ঠনকারীরা তাঁত শিল্পকে ধ্বংস করে, কাঁচামাল তুলো আর কার্পাস ইংল্যান্ড-এ রপ্তানি করতে বাধ্য করল। উল্টে আমদানী হতে থাকল ইংল্যান্ডের কারখানায় তৈরী কাপড় ও কাপড়জাত অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী। নীল রপ্তানীর জন্য বাধ্য করা হল কৃষকদের নীল চাষ করতে। চীন সরকার আফিমের আমদানী বন্ধ করে দেয়। ইংরেজরা ভারতের মাটিতে আফিমের চাষ বাড়িয়ে চীনে তা রপ্তানী করতে থাকে। কলকাতা ক্রমে হয়ে ওঠে চীনে আফিম রপ্তানী-র প্রধান বন্দর।

পৃথিবীর মানচিত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী হয়ে উঠল শিল্প-বিপ্লবের দ্বারা সৃষ্ট বিকাশমান শিল্প পুঁজিবাদের প্রবক্তা। কিন্তু কিভাবে? উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছর ধরে এই একতরফা বাণিজ্যের নামে শোষণ ও ভারতীয় পণ্য-সামগ্রীর বাজার নষ্ট করার ফলে গ্রামের মানুষ, তাঁতী, কারিগর ও কুটিরশিল্পে নিযুক্ত শ্রমজীবিরা তাদের উপার্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে নিঃস্ব ও হতদরিদ্র হয়ে যায়। চাষী ও কারিগরেরা নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হল। দেশের সম্পদ জমা হতে থাকল পুঁজিপতিদের হাতে। দেশীয় মহাজন ও সুদখোরেরা তার কিছু অংশ ভাগ পেল। শুধু তাই নয়, বৃটিশ শিল্পপতিদের স্বার্থে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতের পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতিতে হাত দেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বৃটিশ পুঁজি লগ্নি করে হয় রেললাইন স্থাপনে। এছাড়া, চা বাগান, কয়লাখনি, চটকল ইত্যাদি লাভজনক ব্যবসায় ইংরেজরা টাকা লগ্নি করে জাঁকিয়ে বসল।এ সব ব্যবসায় ভারতীয় দের দাস শ্রমিকদের মতই ব্যবহার করা হত। ভারত হয়ে উঠল ইংরেজের সোনার ডিম পাড়া হাঁস। সে কেটে ফেললেও ডিম দেয়, মেরে ফেললেও দেয়।

ভারতের অর্থনীতি কে বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করে দিলেও তার কোনো সুফল দেশের মানুষ পায় নি। ভারত বৃটিশ সাম্রাজ্যের মুকুটমণি বলে অভিহিত হলেও, আমদের দেশের মানুষ না পেল বাঁচবার অধিকার, না পেল অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ।

গোটা দুই শতক জুড়ে ভারতের সাধারণ মানুষের বিদ্রোহের এটাই হল প্রেক্ষাপট।

আর্য চ্যাটার্জি
কলকাতা

ছবিঃ
উইকিপিডিয়া

বায়োস্কোপের বারোকথা: বাংলা ছবির নতুন পরিচালকেরা

(আগের সংখ্যার পর)

এই যে আমরা 'পথের পাঁচালী'র কথা এত গর্ব করে বলি, আমরা কি ভেবে দেখেছি, 'পথের পাঁচালী'র গল্প বলার সময়ে সত্যজিত রায় কোন চরিত্রের চোখ দিয়ে জীবনকে দেখেছিলেন? না, হরিহর, সর্বজয়া বা ইন্দির ঠাকরুনের চোখ দিয়ে নয়। এই দেখা এত নির্মল, এত সবুজ, এত শোকতাপহীন যে অপুর মত নিষ্পাপ বালক ছাড়া কেউই তা দেখতে পারে না! এইজন্যই ছবিতে দিদি দুর্গার মৃত্যু ও ঠাকুমার মত ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যু আমাদের মনে কোন স্থায়ী মেঘ জমায় না। একটু পরেই জীবন বয়ে চলে; রোদ্দুর ওঠে।

এরকমভাবেই তৈরি হয়েছিল ঋত্বিক ঘটকের ছবি 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'। ছোটদের নিয়ে এত ভাল সিনেমা বাংলায় খুব কমই হয়েছে। কি সুন্দরই না ছিল কচি হাতের ছবিতে ভর্তি খালেদ চৌধুরির করা ছবির ক্রেডিট টাইটেল। এক ছোট ছেলে কাঞ্চন- সে বাড়ি থেকে পালিয়ে রূপকথার টানে তার স্বপ্নের দেশ 'এল ডোরাডো' খুঁজতে কলকাতায় আসে। তার চোখে দেখা কলকাতা কিন্তু খুব মনোরম নয়। তখন অনেক গরিব মানুষের ভীড় কলকাতায়। নানারকম বাস্তুহারা মানুষ দেশবিভাগের ফলে কলকাতার রাস্তায় আশ্রয় নিয়েছেন। মানুষের পড়ার মত কাপড় নেই, খাওয়ার মত খাদ্য নেই।

কাঞ্চন দেখে কত উঁচু বাড়ি! পরিচালক ক্যামেরাকে খুব নিচু থেকে ব্যবহার করায় বাড়িগুলি যত উঁচু তার থেকেও বেশি উঁচু দেখায়। কাঞ্চন তো গ্রামের ছেলে, সে আসলে এত উঁচু বাড়ি কখনো দেখেনি। কাঞ্চনেরই মত আরেকটি ছোট মেয়ে- সে অবশ্য এই শহরের বড়লোকের মেয়ে- অবাক হয়ে যায় যে বড়রা এত অবুঝ কেন। তার মনে হয় -

তেলের শিশি ভাংল বলে
খুকুর 'পরে রাগ কর
তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ কর
তার বেলা?

বাড়ি থেকে পালিয়ে

ঋত্বিক ঘটক অবশ্য ছোটদের ছবির ছাড়াও বড়দের জন্যউনেক ছবি করেছেন, আর তার জন্যই তাঁর এত নাম ডাক। তিনি জীবনে কোন বড় পুরষ্কার পাননি। কিন্তু বাঙালি সমঝদার দর্শক তাঁকে চিরদিন শ্রদ্ধা করবে। তিনি সেই যুগের সাধারণ মানুষের জীবনের কথা বলতেন, আর তার সাথে জুড়ে দিতেন রামায়ণ-মহাভারত-উপনিষদ-পুরাণের নানা গল্প। কেন দিতেন? কেননা তিনি মনে করতেন যে সময়ের দুঃসহ চাপে যেন আমরা অতীতের স্মৃতি না ভুলে যাই।

ঋত্বিক ঘটকের তৈরি 'অযান্ত্রিক', 'সুবর্ণরেখা', 'মেঘে ঢাকা তারা' আর 'তিতাস একটি নদীর নাম'- এইরকমের ছবি। তাঁর ছবিতে অনেক সময়েই শেষ মূহুর্তে একটি বালক বা শিশু থাকে; সে আমাদের জানায় যে ভবিষ্যত অন্যরকম হবে।

এই ভাবেই সামান্য মাঝিমাল্লার গল্প বলতে পেরেছিলেন রাজেন তরফদার তাঁর 'গঙ্গা' ছবিতে। এর আগে বাংলা সিনেমায় আমরা গরিব মানুষ দেখলেও এইভাবে দেখিনি। এই প্রথম আমরা দেখলাম যে যারা নৌকা বায়, মাছ ধরে, তাদের বেঁচে থাকা দুঃখময় হলেও সুন্দর। আমরা যেন নতুন করে চিনলাম এই সব মানুষদের।

এই দলেই একটু পরে যোগ দিলেন মৃণাল সেন। তাঁর প্রথম ছবি 'রাতভোর' তেমন ভাল হয়নি। কিন্তু '২২শে শ্রাবণ' নামে ছবিটি মানুষের মনে খুব রেখাপাত করল। ২২শে শ্রাবণ আমাদের জাতীয় শোকের দিন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতিথি। কিন্তু এই ছবিতে মৃণাল সেন রবীন্দ্রনাথের কথা বলেননি। এই ছবি একজন ফেরিওয়ালা ও তার স্ত্রীর জীবনের গল্প।

এই মৃণাল সেন ও পরের দিকে ছোটদের জন্য রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাপূরণ গল্পটিকে নিয়ে ছবি বানিয়েছিলেন। কিন্তু লোকে তাঁকে বড়দের ছবির জন্যই মনে রাখবে। তাঁর ছবির মধ্যে নামকরা ছবিগুলি হল 'আকাশকুসুম', 'ইন্টারভিউ', 'একদিন-প্রতিদিন'। হিন্দীতে তাঁর করা 'ভুবন সোম' ছবিটি আমাদের নতুন করে হিন্দী ছবি সম্পর্কে ভাবতে শিখিয়েছিল।

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক
চলচ্চিত্রবিদ্যা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ছবির খবর: কুং-ফু প্যান্ডা ২

এবারের ছবির খবরে আমাদের পছন্দের ছবি হল 'কুং-ফু প্যান্ডা ২'। এই ছবি হল ২০০৮ সালে তৈরি অ্যানিমেশন ছবি 'কুং-ফু প্যান্ডা'র দ্বিতীয় পর্ব। তুমি কি কুং-ফু প্যান্ডা দেখেছ? যদি না দেখেও থাক, তাহলেও 'কুং-ফু প্যান্ডা ২' দেখতে কোন অসুবিধা নেই। প্যারামাউন্ট পিকচার্সের নিবেদনে ড্রিমওয়ার্ক্স অ্যানিমেশনের তৈরি এই ছবিতে আছে একেবারে এক আনকোরা গল্প।

গংমেন নগরী

প্রাচীণ চীনদেশে, গংমেন নগরী শাসন করত ময়ূরবংশ। সেই রাজত্বে সবাই খুব আনন্দে ছিল কারণ ময়ূরেরা ঝলমলে আতশবাজী তৈরি করেছিল। কিন্তু ময়ূররাজার ছেলে, শেন, বুঝতে পেরেছিল যে এই আতশবাজীর ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে অস্ত্র তৈরি করে সারা দেশে শাসন করা যায়। সে একদিন শুনতে পেল রাজার ভবিষ্যতবক্তা ছাগল রাজাকে বলছে যে "সাদা-কালো এক যুদ্ধবাজ" শেন কে একদিন পরাজিত করবে। এই কথা শুনে শেন নিজের সাঙ্গোপাঙ্গোদের দিয়ে প্যান্ডাদের একটা পুরো গ্রাম ধ্বংস করে দিল। তার বাবা মা এই ঘটনায় খুব দুঃখ পেয়ে শেনকে গংমেন নগরী থেকে নির্বাসিত করলেন। শেন এই বলে চলে গেল যে সে প্রতিশোধ নিতে একদিন ফিরে আসবে।

ময়ূর রাজা ও রানী

তিরিশ বছর পরে, পো নামের প্যান্ডা হয়ে উঠেছে কুংফু মাস্টার এবং ড্রাগন ওয়ারিয়র খেতাব

পেয়েছে। সে তার পাঁচজন কুংফু বিশেষজ্ঞ সংগীকে নিয়ে শান্তির উপত্যকাকে রক্ষা করে চলে। একদিন একদল নেকড়ে ডাকাতদের থেকে একটা গ্রামকে রক্ষা করতে গিয়ে সে তাদের নেতার বর্মে একটা চিহ্ন দেখে চমকে যায়। তার নিজের মা'কে মনে পড়ে। তার অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে নেকড়েগুলো পালায়। পো বাড়ি ফিরে তার বাবাকে জিজ্ঞেস করে সে কোথা থেকে এসেছিল।

পো আর তার পালক পিতা

তার বাবা বলেন তিনি তাকে খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর রেস্তোঁরার জন্য আসা মূলোর বাক্সে। যেহেতু কেউ তার খোঁজে আসেনি, তাই তিনি তাকে নিজের ছেলে বলে পালন করতে শুরু করেন।

এর পরে, পো এর শিক্ষক শিফু খবর পান যে সুদূর গংমেন শহরে শেন ফিরে এসেছে; সে তার আগ্নেয়াস্ত্র কামান দিয়ে শহরের রক্ষাকর্তাদের একজনকে মেরেও ফেলেছে। গংমেন শহরকে শেনের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে পো এবং তার পাঁচ বন্ধু যাত্রা করে।

শেন

সেখানে গিয়ে কি হল? পো আর তার সংগীরা কি পরাজিত করতে পারল দুষ্ট শেন কে? আর পো কি খুঁজে পেল তার নিজের আসল পরিচয়? সেটা জানতে হলে দেখে ফেলতে হবে 'কুং ফু প্যান্ডা ২'। অসাধারণ থ্রি-ডি অ্যানিমেশন আর বিভিন্ন চরিত্রে বিখ্যাত অভিনেতাদের স্বরক্ষেপণ এই ছবির এক বিশেষ পাওনা। খুব শিগ্‌গির এই ছবির ডিভিডি কিনতে পাওয়া যাবে। তখন কিনে দেখতে ভুলো না কিন্তু।

পো এবং তার সঙ্গী টাইগ্রেস

মহাশ্বেতা রায়
পাটুলি, কলকাতা

দেশে-বিদেশে: ঈশ্বরের বাসভূমি গাড়োয়াল

সেই ভোর চারটের সময়ে জোর করেই ঘুম থেকে উঠে পড়েছি। ট্রেন নাকি সাড়ে চারটের সময়ে গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। জানলার বাইরে তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। ট্রেন থামল। এ.সি. কামরার এই এক ঝামেলা। দরজা খুলে না দেখলে অন্ধকারে কোথায় দাঁড়াল ট্রেন সে বোঝার উপায় নেই জানলার কালো কাঁচের মধ্যে দিয়ে। তবে দেখলাম, দরজা খুলেও বোঝার উপায় নেই সে ট্রেন কোথায় দাঁড়িয়েছে। বাইরেও ঘুটঘুটে অন্ধকার। সেই কলকাতা থেকে টানা চলছে তো, হাঁপিয়ে গেছে বেচারা। মাঝে মাঝেই নিজের খেয়ালে থেমে যাচ্ছে।

ধুঁকতে ধুঁকতে শেষমেষ পৌনে সাতটার সময় হরিদ্বারে এসে ট্রেন বলল, " দয়া করে নামুন এবার!"

স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার কথা। দেখলাম সেই কথামত সাদা অ্যাম্বাসাডর থেকে নেমে এসে এক বয়স্ক মানুষ বল্লেন,"আইয়ে সাব..." তাঁর বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি বলে মনে হল। বলেই ফেললাম, "আপ চালায়েঙ্গে গাড়ি?" ভদ্রলোক ঠিক এমনভাবে হাসলেন, মনে হল এরকম প্রশ্ন তিনি অনেকদিন অনেকের কাছেই শুনেছেন। বললেন, "জী হাঁ, 'ম্যায়' হি চালাউঙ্গা!"

হরিদ্বারে গঙ্গা আরতি

হরিদ্বারে থাকার পরিকল্পনা নেই, তবে গাড়োয়ালে যেখানেই যাও, অনেক সময় লাগে গাড়িতেই, শুধু মুসৌরি ছাড়া। আমার গন্তব্য চোপতা- সুদূর চোপতা। আট থেকে নয় ঘন্টার রাস্তা। তাই একটু 'ফ্রেশ' না হয়ে বেরোনোর প্রশ্নই নেই। একটা হোটেলে উঠতে গেলাম।হরিদ্বারে আবার একা কোন হোটেলে ঠাঁই দিতে লোকে নারাজ। এখন নাকি অনেক কড়াকড়ি, 'ফ্যামিলি' ছাড়া অনুমতি নেই। আমি একা যাত্রী, রাস্তার মধ্যে 'ফ্যামিলি' কোথা থেকে যোগাড় করি? যা হোক করে রাজি করিয়ে একটা ঘর পেলাম। সেখানে এক ঘন্টায় সব কিছু সেরে দুটো ব্রেড টোস্ট মুখে পুরে সেই বয়স্ক ড্রাইভারের সাদা অ্যাম্বাসাডরে চেপে যাত্রা শুরু।

ইতিমধ্যে এত বৃষ্টি হয়েছে যে হরিদ্বারের রাস্তায় দেখি জল থইথই। সে যাই হোক, বৃষ্টির পরে তখন ঝকঝকে রোদ, নীল আকাশ। যেন গাড়ির কাঁচে অনেক জল পড়েছিল, একবার ওয়াইপার চালিয়ে এক্কেবারে পরিষ্কার। গঙ্গার ব্রিজে উঠেই মনটা ভাল হয়ে গেল। মিঠে আলোয় হরিদ্বারকে আরো পবিত্র মনে হচ্ছে। ব্রিজ পেরিয়েই গাড়ি সাইড করে দাঁড়িয়ে গেল। গাড়ির ড্রাইভার বেরোলেন, আমার জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, " ম্যায় পয়ষট সাল কা আদমি হুঁ, আপকো অগর ভরোসা হ্যায় তো চলিয়ে।" আমি বুঝতে পারছি না ঠাট্টা করছেন, নাকি সত্যিই বলছেন! আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে উনি বললেন, " আপনে স্টেশন মে ওয়সা সওয়াল কীয়ে----" আমি বুঝলাম উনি কথাটায় বোধহয় একটু চটেছেন বা দুঃখ পেয়েছেন। বুঝিয়ে বললাম যাতে উনি কিছু মনে না করেন; আমি এমনিই জিজ্ঞেস করেছিলাম।

ব্যাস! তারপর বাকি তিনদিন আমি শুধু এটাই ভেবে চললাম যে আমি কেন বলতে গেলাম এমন একটা কথা! না, না, অনুশোচনা নয়, বাকি তিনদিন ড্রাইভার চামেলিজি এমন গাড়ি চালালেন, জেট বিমান হার মেনে যায়। ভয়ে কাঁটা হয়ে বসে থাকতে হত মাঝে মাঝে। বললে হয়ত পাঁচ মিনিট আস্তে চালালেন, তারপরে আবার মিগ বিমান! পাহাড়ি রাস্তার আঁকবাঁক যেন আমেরিকান হাইওয়ে!

দেবপ্রয়াগ

একে একে পেরিয়ে চললাম ঋষিকেশ, ব্যাসি, দেবপ্রয়াগ, শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগ। দেবপ্রয়াগের পর থেকে যেমন গঙ্গাকে ছেড়ে অলকানন্দার পাশ ধরেছিলাম, রুদ্রপ্রয়াগের পর থেকে মন্দাকিনী সঙ্গী হল। আমার আজ অবধি দেখা সবথেকে সুন্দর নদী এই মন্দাকিনী।

মন্দাকিনী

তার পাশে অপূর্ব ধাপ চাষের দৃশ্য দেখতে দেখতে এগিয়ে চলা। অগস্ত্যমুণি, সিয়ালসোর, চন্দ্রপুরী পেরোতে বেলা গড়িয়ে বিকেল। একটা জায়গায় মন্দাকিনীর ওপর একটা ব্রিজ নজর পড়ল। ব্রিজ পেরিয়ে ওপাড়ে কেদারনাথের রাস্তা। আর আমরা ব্রিজ না পেরিয়ে পাহাড় বেয়ে চড়তে শুরু করলাম উখিমঠের রাস্তায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই উখিমঠের ছোট্ট জনবসতি। সেখান থেকেই শুনছি কানাঘুষো---- আর পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যেই চাক্ষুষ দেখলাম আমার স্বপ্নভঙ্গ! বিরাট এক ধ্বসে সমস্ত রাস্তা বন্ধ। কলকাতা থেকে প্রায় দু'হাজার কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে এসেছি, আর পঁচিশ কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দিলেই চোপতা, আর সেখান থেকে পায়ে হেঁটে তিন কিলোমিটার দূরে তুঙ্গনাথ। ভারতের তথা সমস্ত বিশ্বের সর্বোচ্চ শৈবতীর্থ। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, রাস্তা বন্ধ! অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম সেই পড়ে থাকা পাথরের স্তূপের দিকে। বুঝলাম, ভগবান বোধহয় কালেভদ্রেই "তথাস্তু" বলেন। আমার অসহায় অবস্থা দেখে আশেপাশের গ্রামের কয়েকটা বাচ্চা ছেলে জড়ো হয়ে গেল। তাদের মধ্যে দুজন আমাকে গাড়োয়ালি ভাষায় শোনাল তাদের লোকগীতি। বিদায়ী বেলায়, বিশাল হিমালয়ের মধ্যে আমি কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে গেলাম অন্য এক জগতে।

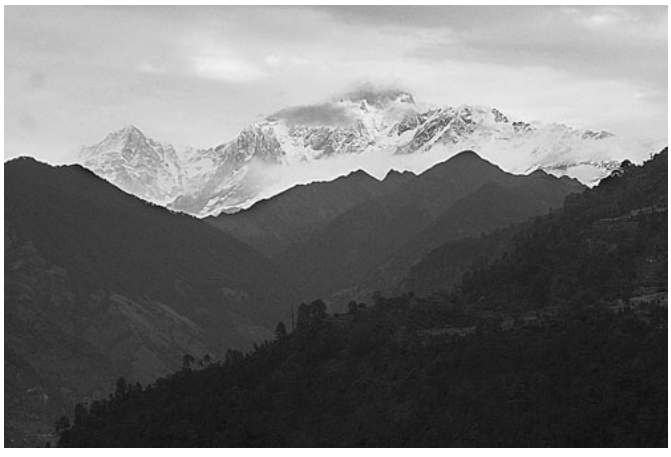

ঈশ্বরের বাসভূমি গাড়োয়াল

মনে মনে বললাম, হয়ত এই গান শোনবার সৌভাগ্য আমার অন্য কোথাও হত না। এও এক অদ্ভুত প্রাপ্তি। শুধু প্রকৃতি নয়, তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা এই অচেনা অজানা মানুষদের সারল্যও টেনে আনবে

আমাকে এই হিমালয়ে, বার বার।

উখিমঠের চারপাশে ধাপচাষ

চামেলিজি কোত্থেকে দু' কাপ চা নিয়ে এলেন। সেই চায়ে চুমুক মেরে ফিরে চললাম খানিক দূরেই ফেলে আসা উখিমঠে। এই ছোট্ট জনপদে সেপ্টেম্বরের অবেলায়ে আমিই একলা ট্যুরিস্ট। একটা নতুন তৈরি ছিমছাম হোটেল পছন্দ হল। একটা ঘর বেছে নিয়ে মালপত্র নামালাম গাড়ি থেকে। তখনও দিন ফুরায়নি, শুনলাম মন্দিরে সন্ধ্যারতি শুরু হবে। ট্রাইপডে ভিডিও ক্যামেরা লাগানোই ছিল। গলায় স্টিল ক্যামেরা ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম মন্দিরের উদ্দেশ্যে।

কেদারনাথের মন্দির দেওয়ালির পর যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন এই উখিমঠের মন্দিরেই নামিয়ে আনা হয় তাঁর বিগ্রহ। আবার অক্ষয় তৃতীয়ার ঠিক আগে ধুমধাম করে যাত্রা হয় সেই বিগ্রহের, উখিমঠ থেকে কেদারনাথ মন্দিরের পথে। উখিমঠ যেন সেই শান্তির জায়গা যেখানে শীতের বরফ বিছানো দিনে স্বয়ং কেদারনাথও মোক্ষ অনুভব করেন।

আরতি শুরু হয়ে গেছে। ছবি তোলার সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে, পরণে থ্রি- কোয়ার্টার প্যান্ট আর গায়ে একটা ফোটোগ্রাফার'স জ্যাকেট চাপিয়ে চলেছি। কয়েকটা ছোট ছেলে দেখলাম বলাবলি করছে। "ইয়ে শায়দ হমারে দেশ কে নহি হ্যায়!" আমি ঘাড় ঘুরিয়ে হেসে মনোজ কুমারের মত তাদের বললাম, "ম্যায় ভি তুমহারে তরহা এক হিন্দুস্থানি হুঁ।" পরে এই ফিল্মি ডায়ালগের কথা মনে করে নিজেরই হাসি পেল।

মন্দিরে পৌঁছে দেখি সেখানে মন্থর গতিতে ঢাক বাজছে, ঘন্টা বাজছে আর ক্যাসেট বাজিয়ে মন্ত্র পড়া চলছে মাইকে। কিন্তু সন্ধিক্ষণে সেই উখিমঠের মন্দিরে এসে, এখনও মনে হয় কত যুগ পেছনে চলে এসেছি কোনও এক সুদূর অতীতে। কলকাতার রাস্তা-ঘাট, যানজট, হুল্লোড়, সব মিথ্যে মনে হয়। এখানেই চিরকাল থেকে যেতে ইচ্ছা করে। ভাবি, কি হবে যদি আমি আর না ফিরি?

উখিমঠের মন্দির

পকেটে হটাৎ ফোন বেজে ওঠে।
"হ্যালো, মা! আমি এখন উখিমঠের মন্দিরে। আরতি হচ্ছে। তোমরা থাকলে কি ভাল হত!"

লেখা ও ছবিঃ
ঋতম ব্যানার্জি
কলকাতা

পরশমণি

শুঁয়োপোকার কথা

তোমার বাবা-মা এর সাথে তোমার মিল কোথায় জান? বাইরের চেহারায়, এ ছাড়া আর কিসে হবে! তাঁদের যেমন দুটো হাত, দুটো পা, মুখ, নাক, চোখ, কান- --তোমারও ঠিক তেমনই আছে।

একটা বিড়ালছানা বা একটা কুকুরছানারও তাই। ওরা ওদের মা-বাবার মত দেখতে। কিন্তু কিছু কিছু প্রাণীর ক্ষেত্রে কিন্তু বাচ্চাদের সঙ্গে মা-বাবার চেহারার কোনও মিল নেই!

বলতে পারবে এমন কোনও প্রাণীর নাম?এমন প্রাণীদের মধ্যে নাম করতে পারা যায়, এই যেমন ধর, প্রজাপতি বা মথ। ডিম ফুটে বেরোন বাচ্চা, ('লার্ভা') একেবারেই প্রজাপতি বা মথের মত নয়। এদের নিয়ে দু'চার কথা বলি।(কেবল যে প্রজাপতি বা মথইএমন প্রাণী, তা কিন্তু নয়। মশা, মাছি বা আরও কিছু কিছু পোকা-মাকড়ও এই শ্রেণীভুক্ত)।

প্রজাপতি বা মথেরা ডিম পাড়ে গাছের পাতায়, সাধারণত পাতার নীচের দিকে। ডিমের গায়ে আঠার মত একটা কিছু থাকে যা ডিমগুলোকে পাতার সাথে আটকে রাখে। কয়েক সপ্তাহ পরে ডিম ফুটে যে বাচ্চা বের হয়, সে কিন্তু মোটেই প্রজাপতি বা মথের মত নয়! তবে?

সেটা একটা এমন জিনিষ যা আমরা অহরহই দেখতে পাই। সেটা আসলে একটা শুঁয়োপোকা -- মথ বা প্রজাপতির 'শূককীট' বা' লার্ভা'।এদের কেউ কেউ নিরীহ গোছের, কেউ কেউ আবার ভয়ংকর। দেখলেই গা শির শির করে! শত্রুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য এদের গায়ে থাকে অসংখ্য শুঁয়ো, আক্রান্ত হলে যা এরা শত্রুর গায়ে বিঁধিয়ে দেয়। (সঠিকভাবে বলতে গেলে ওরা নিজেরা বিঁধিয়ে দিতে পারে না, ওদের ধরতে গেলে আপনা থেকেই বিঁধে যায়)। সেই জন্য এদের নাম শুঁয়োপোকা। কি, কোনও দিন শুঁয়োর কাঁটা গায়ে বিঁধেছে কি? কেমন জ্বালা!

শুঁয়োপোকা

কারও শুঁয়ো থাকে না, তারা আবার নানা রঙের হয়। এই রং গুলো আবার এমনি এমনিই হয় না, এ সবও ঐ আত্মরক্ষার ব্যাপার। রং গুলো ভারি বিষাক্ত হয়। পতঙ্গভুক পাখিরা ভয়ে শুঁয়োপোকা ধরে খায় না!

সবুজ রঙ্গের শুঁয়োহীন একরকমের পোকা দেখা যায় লেবু বা গন্ধরাজ জাতিয় ফুলগাছে। সবুজ হওয়ার কারণে পাখী বা ঐ জাতীয় শত্রুরা সবুজ পাতার সাথে শুঁয়োদের গুলিয়ে ফেলে! শত্রুর আক্রমনের হাত থেকে ওরা বেঁচে যায়। তা বলে আবার ভেবে বস না যে সবাই সবুজ হবে!

শুঁয়োপোকা গুলোর ভীষন খিদে, সারা দিন কোন কাজ নেই কেবল খাওয়া ছাড়া। ওরা সাধারণত সব রকমের পাতা খায়, তবে কারও কারও আবার একটু বাছবিচারও আছে! আমাদের বাগানে লিলি ফুল গাছে এক রকমের পোকা দেখেছি যাদের গায়ের রং গাঢ় বেগুনির ওপর হলুদ হলুদ দাগ, ভারি সুন্দর দেখতে। সুন্দর হলে কি হবে, ভীষন হাভাতে! কয়েকজন মিলে আট দশটা (আনারস পাতার মত) লম্বা পাতাওয়ালা একটা গাছকে একদিনেই শেষ করে দিতে ওস্তাদ! পাতা শেষ হয়ে গেলে এমনকি মাটির নীচে থাকা পেঁয়াজের মত (যাকে 'বাল্ব' বলে) অংশটা পর্য্যন্ত খেয়ে সাফ করে দেয়! এদের অন্য কোন গাছের পাতা খেতে দেখিনি।

এরকম বাছবিচার করে তুঁত (Mulberry)গাছের পাতা খায় আর এক রকমের পোকা। এদের কথা একটু পরে বলছি।

ক'দিন খুবসে খাওয়া দাওয়া করে শরীরটা মজবুত করে--এটা করতে হয়, কেন না বেশ কিছুদিন আর খাওয়া চলবে না কিনা-- ওরা একটা নিশ্চিন্ত জায়গা খোঁজে, যেখানে কেউ কোন ভাবে যাতে উত্তক্ত না করতে পারে!

তেমন জায়গা হতে পারে কোন গাছের পাতার নীচে বা কোন স্যাঁতসেঁতে ঘরের দেওয়ালের কোণে। তেমন একটা মনোমত জায়গা পেলে ওরা স্থির হয়ে নিজেদের চারপাশে একটা খোলস তৈরী করে ফেলে, আর তার মধ্যে আশ্রয় নেয়। এই অবস্থাকে বলে 'পিউপা' বা 'মূককীট' অবস্থা। এই অবস্থায় খোলসের মধ্যেই গড়ে ওঠে আস্ত একটা প্রজাপতি অথবা মথ। গঠন সম্পূর্ণ হলে খোলস কেটে প্রজাপতি বেরিয়ে আসে। প্রজাপতিরা যত রংচং-এ হয়, মথেরা অতটা হয় না।

এদের কটা পাখনা বল দেখি! একথুনি বলবে যে, এ আর এমন কথা কি, দু'খানাই ত হবে, নাকি! কিন্তু এটা সঠিক হল না। প্রতি দিকে দু'খানা করে মোট চারখানা পাখনা থাকে এদের, ফলে উড়বার সময় ওদের খুব সুন্দর দেখায়। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে দেখা যায় ওদের পাখনায় রয়েছে অজস্র ছোট্ট ছোট্ট রঙ্গিন আঁশ যার জন্য ওদের রং অত সুন্দর।

তুমি একটা পরীক্ষা করে দেখতে পার, যা থেকে নিজেই জানতে পারবে ওপরে লেখা ব্যাপারগুলো। টিনের ঢাকনাওয়ালা কাচের তৈরী একটা খালি জেলির শিশি যোগাড় করে ফেলো রান্নাঘর থেকে, এর পর পেরেক ঠুকে ঠুকে ঐ ঢাকনায় কয়েকটা ছিদ্র করে ফেলো। এবার কায়দা করে পাতায় বসা একটা শুঁয়োপোকা ধরে ঐ শিশির মধ্যে রেখে তার মধ্যে কিছু টাটকা পাতা (যে গাছের পাতা খাচ্ছিল) ফেলে দাও। এবার শিশির মুখটা বন্ধ করে দাও। এর পর লক্ষ্য কর ঐ পোকাটা কি করছে! কি আর করবে, খালি ঘুরবে আর পাতা খেতে থাকবে। পাতা ফুরিয়ে গেলে সাবধানে ঢাকনা খুলে আরও কিছু পাতা দিয়ে দেবে।

ঢাকনায় ছিদ্র করতে বললাম কেন বলতে পার? শিশির মধ্যে বাতাস ঢুকবার জন্য। না হলে পোকাটা দম বন্ধ হয়ে মারা পড়বে ত!

ওপরে যা যা লিখেছি সব তোমার চোখের সামনে ঘটতে দেখতে পাবে! যেদিন প্রজাপতি দেখা যাবে,

সেদিন ঢাকনা খুললেই সেটা দিব্যি ফুর ফুর করে উড়ে যাবে।

বাছবিচার করে তুঁত গাছের পাতা খাওয়া যে শুঁয়ো- পোকার কথা একটু আগে বলেছিলাম, সেটা এখন বলি।সিল্কের সুতো, যা দিয়ে সিল্কের শাড়ী বা জামা তৈরী হয়, তা তৈরী করে ঐ তুঁতপাতা খেকো শুঁয়ো পোকা!

এরকম আরও কয়েকপ্রকার পোকা আছে যারা অন্য রকমের গাছের পাতা খায়, তারা অন্য রকম সুতো তৈরী করে। সেই সব সুতো দিয়ে তৈরী হয় তসর, এন্ডি, মুগা--- এই সব কাপড়। দেখেছো এসব?

যাকগে, আমরা সিল্ক তৈরী করা পোকা নিয়ে কথা বলছিলাম, সেই কথা বলি।

সিল্ক-মথ থেকে সিল্কের সুতো তৈরী করা আমাদের দেশে একটা ব্যাবসায় বিশেষ। ব্যাবসায়িক ভিত্তিতেই এই মথের চাষ করা হয়। মথেরা ডিম পাড়ে প্রায় শ'পাঁচেকের মত আর ১০-১২ দিন পর ডিম ফুটে লার্ভা বা পোকা বেরিয়ে পড়ে। বেরিয়েই শুরু করে খাই খাই। ওদের সামনে তখন প্রচুর তুঁত গাছের টাটকা পাতা দেওয়া হয়। গোগ্রাসে সেই পাতা গিলে ১৮-২০ দিনের মধ্যেই পূর্ণবয়স্ক পোকায় রূপান্তরিত হয়।

তুঁতগাছ

তখন এই পোকার রং ধুসর বা ক্রীম, আর এরা প্রায় তিন সাড়ে তিন ইঞ্চির মত দীর্ঘ হয়। পোকাদের মুখের ঠিক নীচে একটা ছিদ্রপথে বের হয় একরকম লালা। এই লালা জমেই তৈরী হয় সিল্ক। কি করে? সেটা বলি।

সিল্কমথের লার্ভা

ক'দিন খাওয়া-দাওয়া করে পোকাগুলো পূর্ণবয়স্ক হয়ে গেলে ওরা মূককীট অবস্থায় যাবার জন্য প্রস্তুত হয়। তখন মুখের নীচের ছিদ্রপথে লালা বের করে সরু সরু লালার সুতো দিয়ে এরা নিজেকে ক্রমে ক্রমে জড়িয়ে ফেলে। হাওয়ায় শুকিয়ে লালার সুতো শক্ত সুতোয় পরিণত হয়।

এতে যে জিনিষটা তৈরী হয় তাকে বলা হয় 'রেশমের গুটি'। এই গুটি ডিম্বাকৃতির। তবে ডিমের মত অত বড় নয়।প্রায় ৮০০/ ৯০০ গজ বা তারও বেশী দীর্ঘ সুতো জড়ানো থাকে ঐটুকু জায়গার মধ্যে। তাহলে বুঝছ তো, কেমন সরু ঐ সুতো!

এই গুটির মধ্যে থাকে শূককীট থেকে রূপান্তরিত হয় মূককীট। মূককীট আবার ক্রমশঃ পরিবর্তিত হয়ে শেষ পর্যন্ত সিল্ক মথে পরিণত হয়। এই মথ গুটি কেটে বাইরে বেরিয়ে আসে।

মথকে গুটি কেটে বাইরে বেরিয়ে আসার সুযোগ করে দিলে গোটা গুটির সুতোই নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা, সুতো কেটে বেরোলে সুতোও টুকরো টুকরো হয়ে যাবে কিনা!

তাই গুটি পরিণত হলেই সেগুলিকে গরম জলে সেদ্ধ করা হয়।এর ফলে ভেতরের মূককীট গুলি মরে যায়। এটা মোটেই ভাল কাজ নয়, কিন্তু কি আর করা যাবে, সিল্ক বা রেশম উতপাদন করতে গেলে এই ভাবেই করতে হয়।

সিল্কমথের চাষ এক গুরুত্বপূর্ন ব্যবসা

রয়োজনে অত সরু সুতোকে মোটা করার দরকার হলে আরও কয়েকটা সুতোকে একত্রে পাকিয়ে নিলেই হল। আর সেই সুতো দিয়ে তৈরী হয় পছন্দ মত কাপড়। কাপড়কে আবার রং ও করা যায় মনোমত।

সিল্কের সুতো দিয়ে শাড়ি বোনা হচ্ছে

কি মনে হচ্ছে? শুঁয়োপোকা নিয়ে পরীক্ষাটা করে দেখবে নাকি? তবে সাবধানে কোরো কিন্তু! হাতে শুঁয়া লেগে গেলে ভারি মুশকিল!

সন্তোষ কুমার রায়
কোদালিয়া, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

ছবিঃ
উইকিপিডিয়া

কলেরা গবেষণায় দুই বাঙালির অবদান

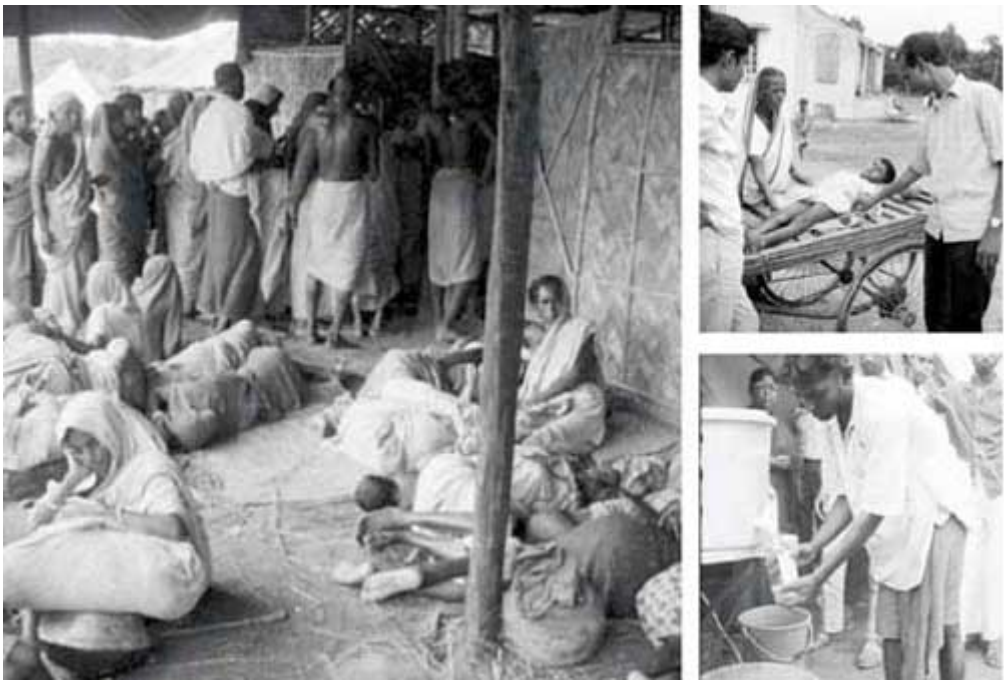

কলেরা এক জীবনঘাতী রোগ। দূষিত জল আর খাবারের মাধ্যমে এই রোগের জীবাণু আমাদের শরীরে ঢোকে এবং অন্ত্রে গিয়ে বংশবৃদ্ধি করে। জীবাণুকোষে এক ধরণের বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ তৈরি হয় যার প্রভাবে অন্ত্রের দেওয়াল থেকে প্রচুর পরিমাণ জল নিঃসৃত হয়। বিপুল পরিমাণ চাল ধোয়া জলের মত মল রোগীর শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। মলের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কিছু আয়ন-ও (সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্লোরাইড) বেরিয়ে যায়। সেই সঙ্গে ঘন ঘন বমি হতে থাকে। রোগী ক্রমশই অবসন্ন ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। শরীরে অতি তীব্র জলাভাব দেখা দেয়। রক্তের তারল্য কমতে থাকে। একটা সময় আসে যখন এত ঘন হয়ে যাওয়া রক্তকে পাম্প করে সারা শরীরের ছড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে আমাদের হৃদযন্ত্রের পক্ষে। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে রোগীর মৃত্যু হয়। রোগীর মলের সঙ্গে রোগ জীবাণুও বাইরে বেরিয়ে আসে এবং জলের মাধ্যমে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কলেরা মহামারীর আকারে দেখা দেয়। ইতিহাসে, সাহিত্যে কলেরা মহামারীর অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। ২০১০ সালে প্রকাশিত এক পরিসংখ্যার অনুসারে প্রতি বছর সারা পৃথিবীতে ৩০ থেকে ৫০ লক্ষ মানুষ কলেরায় আক্রান্ত হন এবং লক্ষাধিক মানুষ এই রোগে মারা যান।

কলেরার আর এক নাম বিসূচিকা রোগ। আবার ওলাউঠা নামেও এই রোগ পরিচিত। (ওলাঃ মল, উঠাঃ বমি)। এই রোগের প্রকোপ সেই সব জায়গাতেই দেখা যায় যেখানে জীবাণুমুক্ত পানীয় হল পাওয়া যায়না এবং স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নেই। এদেশে মানুষের মনে কলেরার বিভীষিকাময় প্রভাব ওলাইচণ্ডী, ওলাবিবি এইসব লৌকিক দেবীদের জন্ম দিয়েছে।

জার্মান বিজ্ঞানী রবার্ট কখ্ কলেরা রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন। কিন্তু এই জীবাণু, যে বিষাক্ত পদার্থ তৈরি করে সেটা ঠিক কিভাবে কাজ করে বহুদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের তা জানা ছিল না। অনেকেই বিশ্বাস করতেন জীবাণু কোষের অভ্যন্তরেই থাকে এই বিষাক্ত পদার্থ। জীবাণুর মাধ্যমেই তা রক্তের সঙ্গে মিশে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। তা ছাড়া অন্ত্রের দেওয়ালে সে আস্তরণ থাকে তারও ক্ষতি

হয় এই বিষাক্ত পদার্থের প্রভাবে। কিন্তু প্রাণীদেহে কলেরার জীবাণু ইঞ্জেকশন করে ঢুকিয়ে কেউই গবেষণাগারে কৃত্রিমভাবে এই রোগ সৃষ্টি করতে পারেন নি।

এ ব্যাপারে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করলেন ডাঃ শম্ভুনাথ দে। হুগলি জেলার গড়বাটিতে এক দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম হয় ১৯১৫ সালে। ব্যক্তিগত স্কলারশিপ আর কিছু ব্যক্তির আর্থিক সহায়তায় তিনি কলকাতা মেডিকাল কলেজ থেকে ১৯৩৯ সালে ডাক্তারি পাশ করেন। এরপর লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজ হসপিটাল মেডিকাল স্কুলে গবেষণা করে পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন। দেশে ফিরে তিনি কলকাতা মেডিকাল কলেজের প্যাথলজি ও ব্যাক্টিরিয়লজি বিভাগে যোগ দেন এবং কলেরা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। কলেরা সম্বন্ধে বিজ্ঞানী সমাজে সেইসময়ে প্রচলিত ধ্যান-ধারণায় তাঁর আস্থা ছিল না। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন কলেরা রোগের জীবাণু অন্ত্রের আস্তরণের কোন ক্ষতি করে না। জীবাণু কোষের বাইরে এসে এই জীবাণুনিঃসৃত বিষাক্ত পদার্থ অন্ত্রের মধ্যেই কাজ করে। এই ধারণা প্রমাণ করার জন্য তিনি একটি খরগোশের ক্ষুদ্রান্ত্রের কিছুটা অংশ ওপর নীচে সুতো দিয়ে বেঁধে, মাঝে ইঞ্জেকশন করে কলেরার জীবাণু ঢুকিয়ে দিলেন। পরদিন দেখা গেল ক্ষুদ্রান্ত্রের ওই অংশ চাল ধোয়া জলের মত তরল পদার্থে (কলেরা রোগীর মলের মত দেখতে) ভরে গেছে। এর পর তিনি গবেষণাগারে কৃত্রিমভাবে কলেরা জীবাণুর বংশবৃদ্ধি ঘটিয়ে কোষ নিঃসৃত তরল পদার্থ খরগোশের ক্ষুদ্রান্ত্রে ঢুকিয়ে একই ফল পেলেন। প্রমাণিত হল কলেরার জীবাণু যে বিষাক্ত পদার্থ তৈরি করে তা এক ধরণের exotoxin (exo:outside) এবং enterotoxin (enteron:intestine বা অন্ত্র)

খরগোশের ক্ষুদ্রান্ত্রের অংশবিশেষ বেঁধে (rabbit ilieal loop) তাঁর পরীক্ষা পদ্ধতি জীবাণু বিজ্ঞানের গবেষণায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি নিজেও এই পদ্ধতির সাহায্যে প্রমাণ করেন আমাদের অন্ত্রে *Escherichia coli* নামে যে নিরীহ জীবাণু বাস করে তারই এক জাতভাই এক বিষাক্ত পদার্থ তৈরি করে। ঐ জীবাণু এখন *Enterotoxigenic E coli* নামে পরিচিত।

ডাঃ দিলীপ মহলানবিশ

কলেরা গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন আর এক বাঙালি বিজ্ঞানী। তিনি হলেন ডাঃ দিলীপ মহলানবিশ (জন্ম ১৯৩৪ সাল)। কলেরা রোগীকে বাঁচাতে শিরা দিয়ে স্যালাইন (সোডিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণ) ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। রক্তে সোডিয়াম ও ক্লোরাইড আয়নের মাত্রা বাড়ে, রক্তের তারল্য বৃদ্ধি পায়। হৃদযন্ত্র সহজেই তা পাম্প করে শরীরে ছড়িয়ে দিতে পারে। রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে। ঠিক সময়মত স্যালাইন দিনে না পারলেই রোগী মারা যায়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের

সময় উদবাস্তু শিবিরে ব্যাপক হারে কলেরা দেখা দেয়। কলকাতা থেকে ডাক্তারী পাশ করে এবং ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় শিশু-চিকিতসায় প্রশিক্ষণ নিয়ে ডঃ মহলানবিশ তখন কলকাতার জন হপকিন্স ইউনিভারসিটি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে এ গবেষণারত। বনগাঁ হাসপাতালে কলেরার মোকাবিলায় তাঁর ডাক পড়ল। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন স্যালাইনের সরবরাহ পর্যাপ্ত নয়। অনেক রোগীর মৃত্যু অনিবার্য। নিজের গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি রোগীদের জলে নুন আর চিনি দিয়ে মিশিয়ে খাওয়াতে লাগলেন। এই পদ্ধতির নাম Oral Redydration Therapy বা ORT. উদরাময় রোগে ভাতের মাড়, নারকোলের জল এসবের উপযোগিতার কথা এর আগে অনেকেই বলেছিলেন। গ্লুকোজের উপস্থিতিতে সোডিয়াম ও ক্লোরাইড আয়ন খাদ্যনালী থেকে শোষিত হয়ে রক্তে মেশে - এই তথ্য জানিয়েছিলেন পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা। কিন্তু শিরার ভেতর দিয়ে স্যালাইন দেওয়ার বহুল প্রচলিত পদ্ধতি বর্জন করে রোগীকে সরাসরি নুন চিনি মেশানো জল খাওয়ানোর ঝুঁকি কেউই নিতে পারেন নি। সঙ্কট মুহূর্তে দিশেহারা না হয়ে ডাঃ মহলানবিশ সেই কাজটাই করে ফেললেন সাহসের সঙ্গে। অবিশ্বাস্য ফল পাওয়া গেল। মৃত্যুর হার নেমে এল শতকরা কুড়ি- ত্রিশ ভাগ থেকে শতকরা তিন ভাগে। এরপরে তিনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় যোগ দিয়ে এই পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিলেন সারা পৃথিবীতে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তাঁর এই কীর্তিকে miracle cure for an old scourge আখ্যা দিল। বিখ্যাত মেডিক্যাল জার্নাল দ্য ল্যান্সেট (The Lancet) ORT কে potentially the most important medical advance of the 20th century বলে ঘোষণা করল। সারা পৃথিবীতে এখন ORT বিপুল গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। সহকর্মী গবেষকদের সঙ্গে নানা সম্মানে ভূষিত হয়েছেন ডাঃ মহলানবিশ।

অতি সামান্য জিনিষ নিয়ে গবেষণা করে যে কত বড় বৈজ্ঞানিক কীর্তি স্থাপন করা যায় তার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন ডাঃ শম্ভুনাথ দে এবং ডাঃ দিলীপ মহলানবিশ। কিন্তু শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে ক'জন এঁদের কথা জানে? কথায় বলে গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না।

একটা জিনিষ তোমরা মনে রেখ। যদি কোন কারণে পেট খারাপ হয়, ঘন ঘন টয়লেটে যেতে হয়,প্রতিবার টয়লেট থেকে ফিরে নুন চিনি মেশানো জল খাওয়া অবশ্যই দরকার। নুন বা চিনি খাওয়ার ব্যাপারে যাঁদের বিধি নিষধ আছে তাঁদের উচিত এ ব্যাপারে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে জেনে নেওয়া তাঁরা ঐ পরিস্থিতিতে কি করবেন। মোট কথা শরীরে জলের অভাব কিছুতেই হতে দেওয়া চলবে না।

ডঃ মাধব চট্টোপাধ্যায়
সেন্টার ফর সেল্যুলার অ্যান্ড মলিকিউলার বায়োলজি
হায়দ্রাবাদ, অন্ধ্র প্রদেশ

ছবিঃ
বিভিন্ন ওয়েবসাইট

জানা-অজানা

পাখি উড়ে গেল কবে

ছোটবেলায় একটা প্রশ্ন খুব শুনতাম।

-একটা গাছে তিনটা পাখি বসেছিল। এমন সময় একটা শব্দ হল। দুটো উড়ে গেল। কটা রইল?
-কেন? একটা রইল।
-হয়নি হয়নি ফেল। রইল তিনটেই?
- কেমন করে?

প্রশ্নকর্তা মুচকি মুচকি হাসত। বলতো, আরে তিনটে উড়ে চলে গেল। আমি গালে হাত দিয়ে ভাবতাম কি হল ব্যাপারটা। ভাবতে ভাবতে একদিন দেখলাম একাই বসে আছি। যত পাখি ছিল গাছে সবই উড়ে গেছে। কোথায় গেল ওরা? যে গাছে ওরা বাসা বাঁধতো, সেসব কোথায়? সব গাছই প্রায় কেটে ফেলা হচ্ছে। শুনেছি জলের অভাবে পাখিদের বড় কষ্ট হচ্ছে। প্রচন্ড গরমে শুকিয়ে আসছে পাখিদের খাবার জলের উৎস। গরমের দিনে একটা পাত্রে জল বাড়ির বাইরে রেখে দেখো তো কত পাখি আসে

আজকে ঠিক করেছি কিছু পাখির ছবি দেখাবো। ব্যাপার হচ্ছে যে এরা সবই কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী অর্থাৎ খোদ বাংলার পাখি। এক সময় হয়তো ওদের দেখা যেত ঝাঁকে ঝাঁকে, এখন ওদের দেখা পাওয়া নেহাতই দুর্লভ। দেখবো, শুধু ছবি দেখে তুমিই বা কজনকে চিনতে পারো?

প্রথমে একটু সহজ পাখি দিয়েই শুরু করা যাক। ওদের কিচির মিচির মিচির দিনভর লেগেই থাকে। খুব দুরন্ত, এরকম এক জুটির ছবি তোলা ভারি মুশকিল।

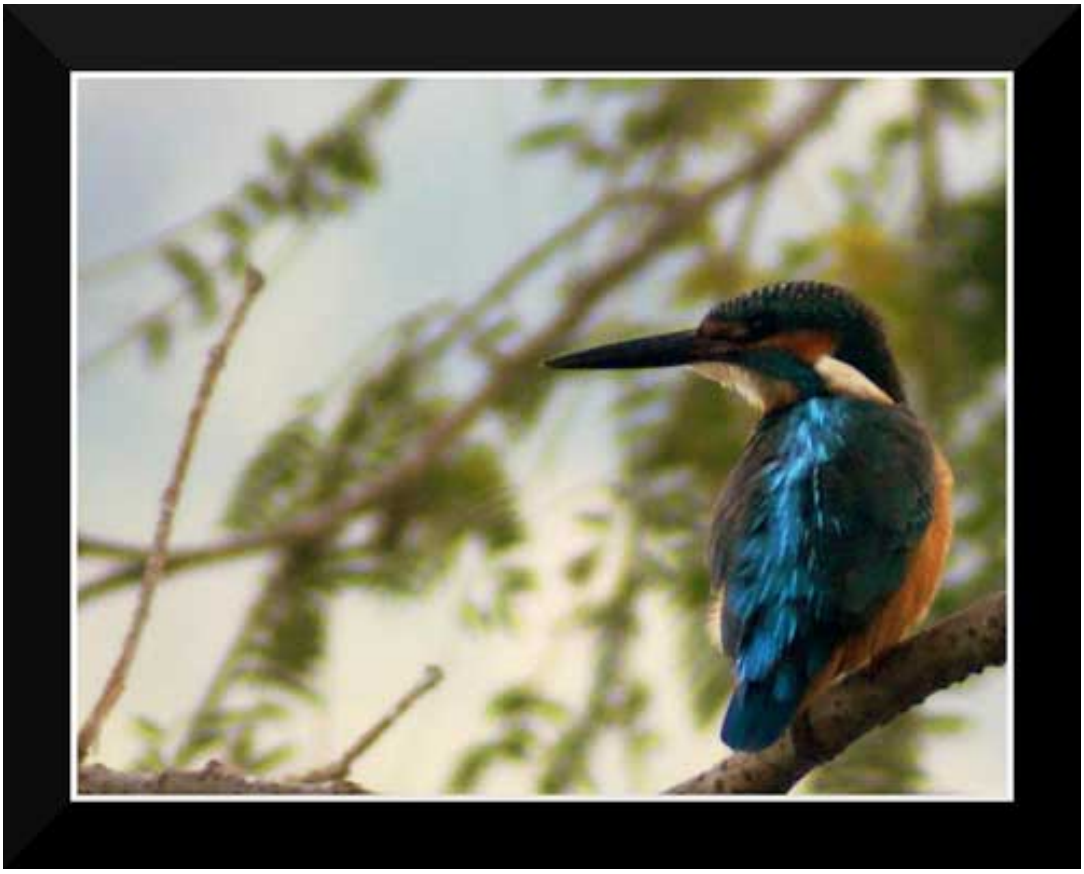

মাছরাঙা সবাই চেনে। কিন্তু বইয়ের পাতার বাইরে দেখেছো কি? মাছরাঙা এসে বসবে কোথায়? পুকুরও তো কমে আসছে।

এর নাম পানকৌড়ি। কিছুটা জলের তলার মাথা ডুবিয়ে খাবার খুঁজেই দেয় ছুট। ইংরাজীতে বলে Cormorant, এদের তিনটি প্রজাতির দেখা মেলে। বাংলায় অবশ্য সবই পানকৌড়ি।

ছাতারে বা Jungle Babbler, অভিমানী কিনা। তাই কিছুতেই ক্যামেরার দিক মুখ ফিরে তাকাবেন না - তুলতে হলে লেজের ছবিই তোলো। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে ছাতারের বৈশিষ্টই হচ্ছে কিনা এদের লেজ। কাজেই একটা ভালো ছবি তুলেছি, কি বলো?

চিনতে পারছো? বুলবুলি বা Red vented Bulbul. ঠিক ঠাক চোখ রাখলে হয়তো নারকোলগাছের পাতায় দেখা পেতে পারো।

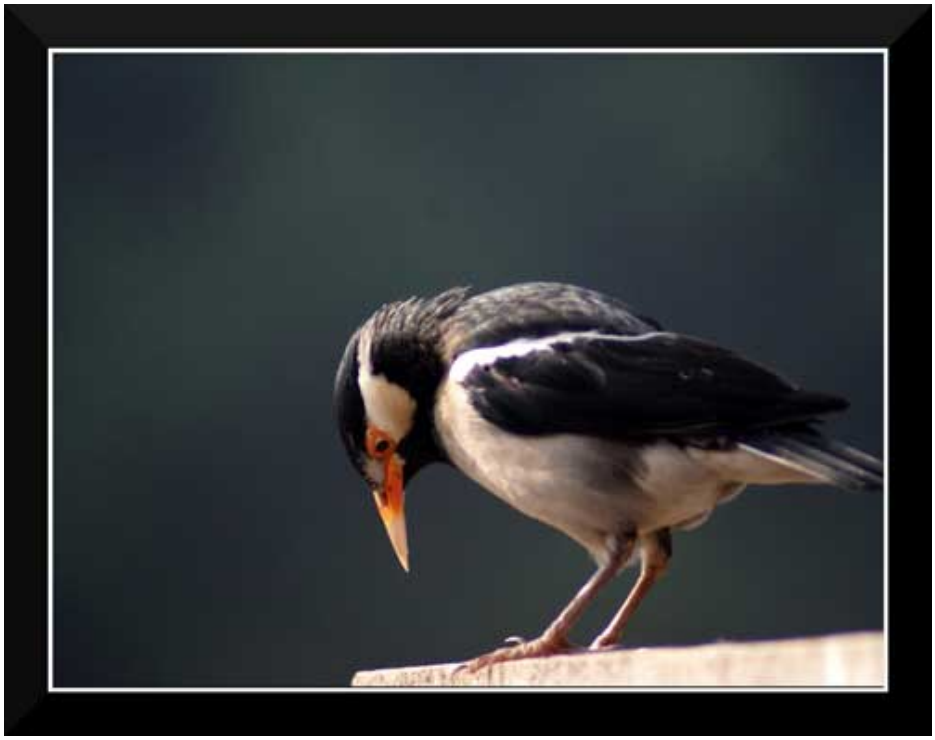

Asian Pied Sterling এরা কিন্তু একধরনের শালিখ। একটু খেয়াল রাখলে এরা নজরে পড়বে সর্বত্রই।

White Wagtail বা সাদা খঞ্জন। এনার সাথে দেখা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে।

এই দুটিই Black Drongo বা ফিঙে – এক্কেবারে ল্যাজঝোলা পাখি যাকে বলে। ফিঙের আরো বেশ কিছু প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায়।

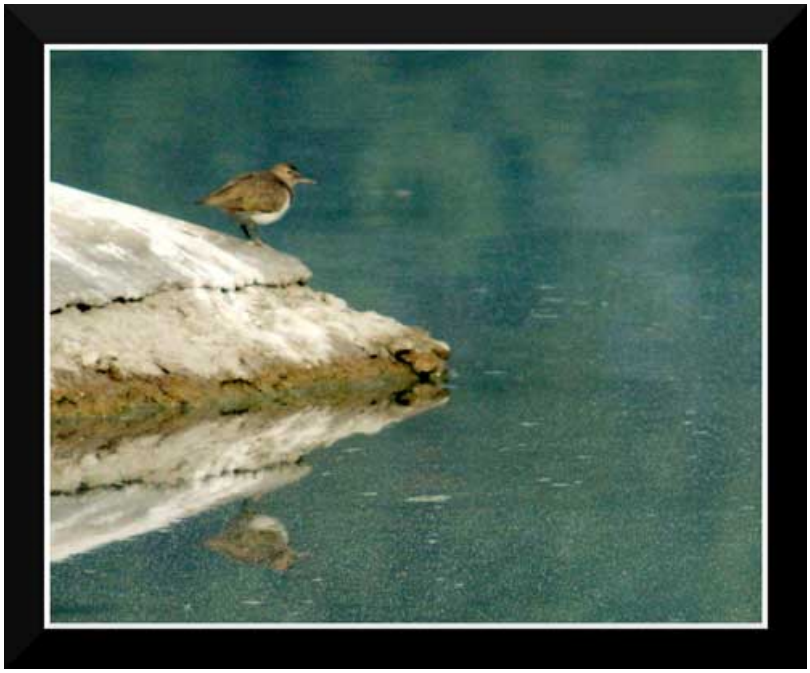

Common Sandpiper বা কাদাখোঁচা। খুবই ছোট্ট পাখি। সৌভাগ্যক্রমে দেখা দিয়েছেন।

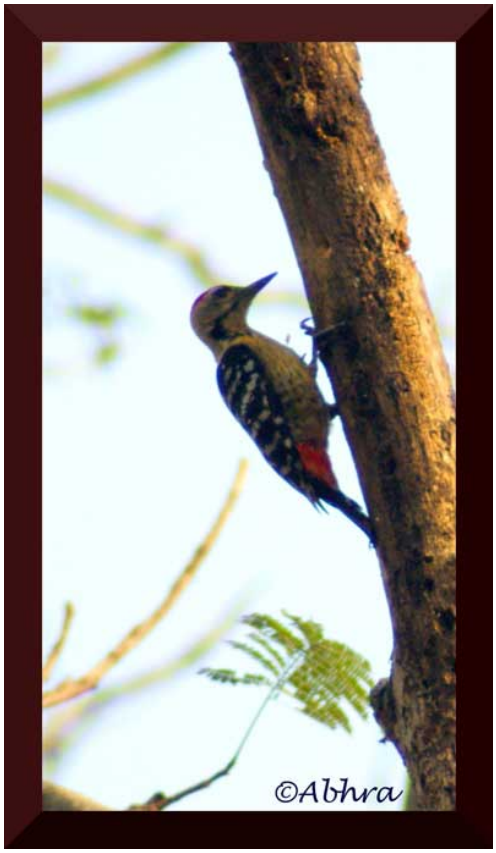

কাঠঠোকরার কথা শুনেছি আমরা সব্বাই। কিন্তু কতবার দেখেছি? আমার সঙ্গে তো এনার দেখা অনেকদিন পরে।

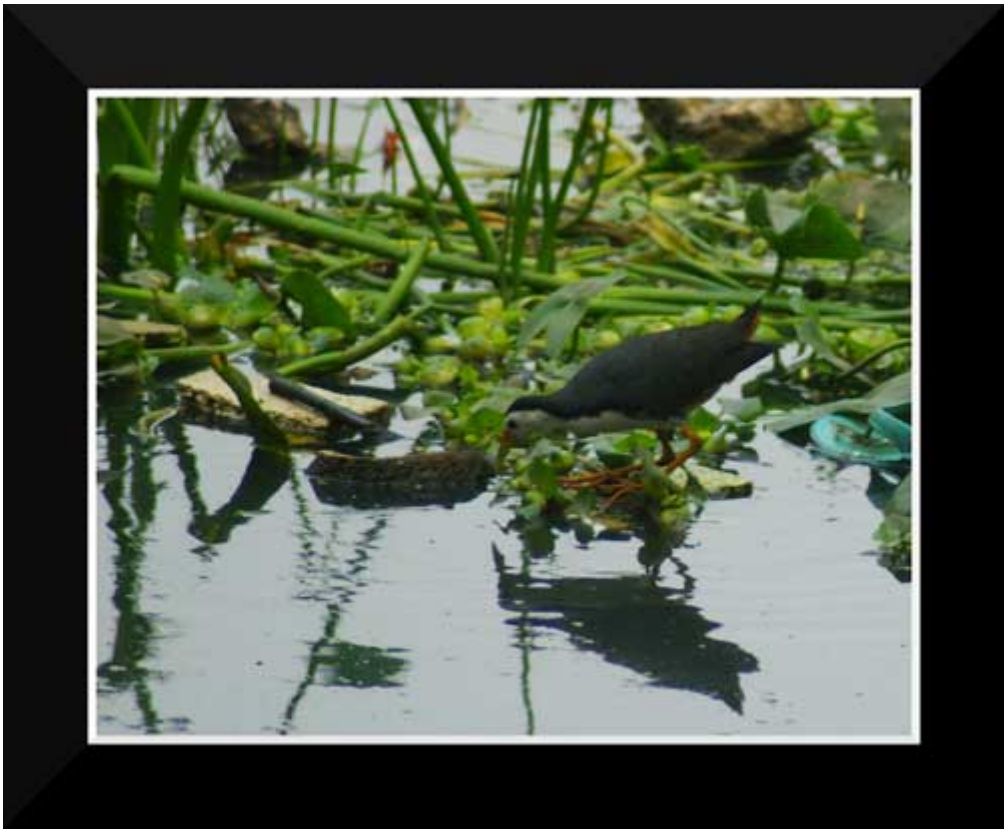

White Breasted Waterhen বা ডাহুক। এদের ডাক বড়ই কর্কশ। তবে কিনা আমি যখন দেখি তখন ইনি শান্ত হয়ে কিছু মাছ খুঁজছিলেন আর কি।

Pond Heron বা কোঁচ বক। শিকারের লক্ষ্যে সতর্ক। তবে শিকার একা করলেও এরা বিশ্রাম করে দল বেঁধেই।

ইনি কে বলো দেখি? সম্প্রতি আমাদের বাড়ির বারান্দায় এসে বাসা বেঁধেছেন। আমাদের যাতায়াতের শব্দে ভয়ডর নেই, দিব্যি আছেন। জানি না কতদিন থাকবেন। তবে মনে মনে বলি – কোথাও যেও না ভাই, এখানেই থেকো।

লেখা ও ছবিঃ
অভ্র পাল
কলকাতা

সাবধান! চোরাবালি!

হলিউড বা বলিউডের অনেক সিনেমাতেই দেখানো হয় যে ভুল করে কেউ চোরাবালিতে ফেঁসে গিয়ে মরে গেলো। কিন্তু এই সব ঘটনার পিছনে কতটুকু সত্য আর কতটুকুই বা মিথ্যে?

১৯৬৪ সালে দুই বন্ধু, জ্যাক আর ফ্রেড, দুজনেই কলেজের ছাত্র, দক্ষিন ফ্লোরিডার অকীচবী হ্রদের চারপাশের জলা জমির মধ্যে পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ খুঁজছিলো। হঠাৎ জ্যাক এর পা নরম বালিতে ঢুকে গেলো। সে তার বন্ধুকে সতর্ক করতে বললো যে সে যেন আগে না আসে। কিন্তু সে নিজে ধীরে ধীরে সেই চোরাবালির মধ্যে ডুবে যেতে থাকলো। তার বন্ধু ফ্রেড তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু, সবই বৃথা গেলো। জ্যাক কিছুক্ষণের মধ্যেই চোরাবালির ভেতরে লীন হয়ে গেলো। এটি একটি সত্য ঘটনা।

তুমি বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনা কিন্তু চোরাবালির মধ্যে ফেঁসে গিয়ে আজ পর্যন্ত শুধু মানুষই নয়, জন্তু জানোয়ার, কার, ট্রাক, এমনকি একবার তো একটি আস্ত রেলের বগি পর্যন্ত গায়েব হয়ে গিয়েছে

চোরাবালি কী এবং কতটা বিপদ্দজনক? এতে কিভাবে কোনো জিনিস বা মানুষ/জন্তু ফেঁসে যায় আর তারপর ডুবে যায়?

অধিকাংশ চোরাবালি সাধারনত মারাত্মক নয়। কিন্তু এটি প্রকৃতির একটি অদ্ভুত বিস্ময়। এই অদ্ভুত জিনিসটাকে ভালোভাবে বোঝা দরকার।

বালি এবং প্রবাহমান জল সাধারনত যখন বালি, কাদা বা নুড়ি ভূগর্ভস্থ জলের প্রবাহের সান্নিধ্যে আসে, সেই বালি বা নুড়ির দানাগুলোর মধ্যে যে ঘর্ষণ শক্তি থাকে তা কম হয়ে যায়, আর সেই বালি বা মাটি, ভার সহ্য করতে পারে না। এই ধরনের ব্যাপার আমরা সমুদ্র সৈকতে দেখতে পাই। সমুদ্র ধারের বালিতে যদি তুমি দাড়িয়ে থাকো, তাহলে খানিক্ষণ পরে দেখবে যে ধীরে ধীরে তোমার পা বালির

ভেতর বসে যাচ্ছে। এটাও এক ধরনের ছোটখাটো চোরাবালি। তবে এই ধরনের চোরাবালির গভীরতা মাত্র কয়েক ইঞ্চি হয়। তাই শুধু আমাদের পায়ের পাতা ডোবে।

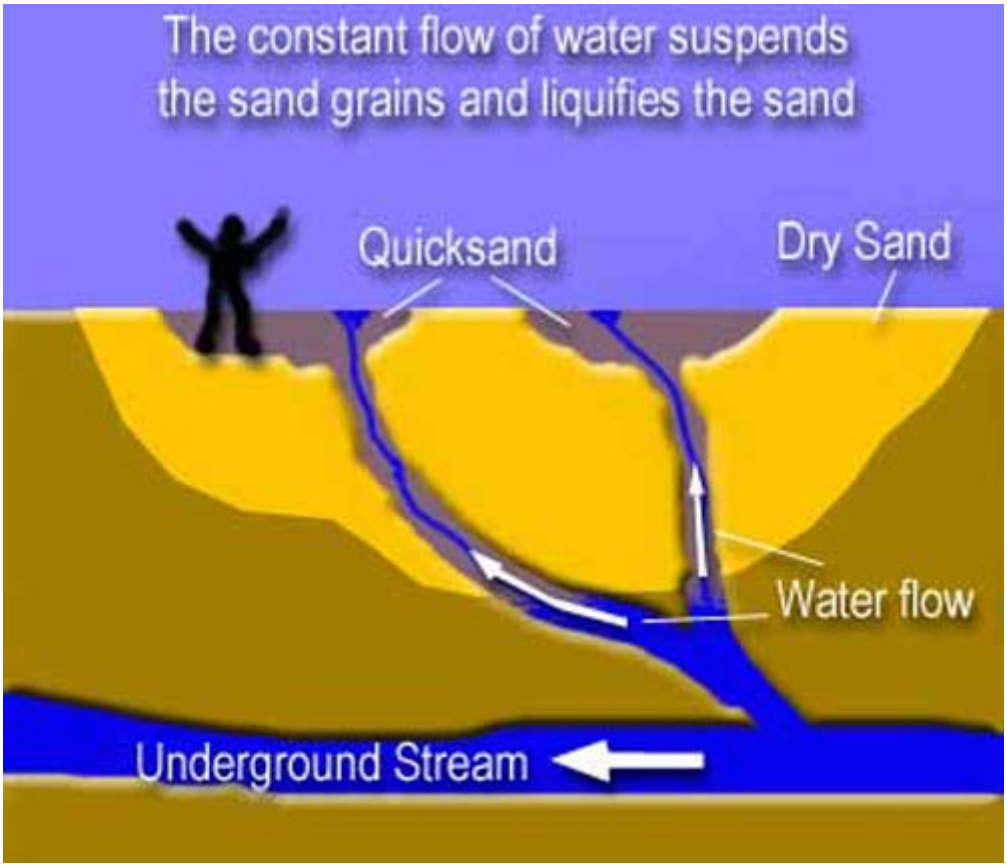

চোরাবালি কিভাবে হয়

অনেকটা এই জিনিসই চোরাবালিতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে মাটি বা বালির ভার সহ্য করার ক্ষমতাটা একদম কমে যায়। প্রবাহমান জলের কারণে বালি বা মাটির দানাগুলোর মধ্যে ঘর্ষণ একদম কমে যায়। পুরো জায়গাটা বেশ গভীর স্তর পর্যন্ত একরকম তরল অবস্থায় চলে যায়। এই ধরনের চোরাবালির গভীরতা যদি কয়েক মিটার বা বেশি হয় তাহলে তা বিপজ্জনক। এই ধরনের চোরাবালিতে ফেঁসে গেলে, বেরিয়ে আসা খুব মুশকিল। হাত পা বালিতে আটকে যেতে পারে। নিজে থেকে বেরিয়ে আসাটা প্রায় অসম্ভব হয়ে যায়। পুরোপুরি ডুবে যেতে পারে। অনেক সময় এই ধরনের চোরাবালির গভীরতা বেশি না হলে মানুষ পুরো ডুবে না গিয়ে অর্ধেক ডুবে আটকে যেতে পারে। এই ধরনের পরিস্থিতিও কিন্তু কম বিপজ্জনক নয়। পুরো না ডুবলেও, ঠান্ডা বা ক্ষুধাজণিত কারণে মৃত্যু হতে পারে। চোরাবালিতে আটকে গিয়ে বেরোতে না পেরে জংলি জানোয়ার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অনেক লোকের মৃত্যু ঘটেছে।

তাই যেসব জায়গায় চোরাবালি থাকার সম্ভাবনা আছে, এই সব জায়গায় একা একা বেড়াতে যাওয়া উচিত নয়। যেসব জায়গায় জল বেশি, সেই সব জায়গায় চোরাবালি থাকার সম্ভাবনাও বেশি। যেমন ধর জলা, নদী, খাঁড়ি, সমুদ্রতীর এবং জলাভূমি, এসব জায়গায় চোরাবালি থাকার সম্ভাবনা বেশি। যেসব জায়গায় ভূগর্ভস্থ জলের প্রবাহ থাকে, সেখানে চোরাবালি থাকতেই পারে।

তুমি কি জানো, মরুভূমিতে কখনো চোরাবালি থাকে না। মরুভূমিতে অনেক বালি, কিন্তু জল নেই যে। আর জল ছাড়া চোরাবালি হবে কি করে। তাই না?

তবে চোরাবালি আমাদের ভুবিদ্যায় অনেক কাজে লেগেছে। কেমন ভাবে বলত? আসলে প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকেই পৃথিবীতে চোরাবালি আছে। সেই সময়কার যেসব জীব জন্তুরা চোরাবালিতে আটকে মারা গেছিলো তাদের অবশেষ মাটিতে থেকে ফসিলে পরিণত হয়েছে।

তোমরা কি "জুরাসিক পার্ক" সিনেমাটি দেখেছ? তাতে যেসব ডাইনোসরদের দেখানো হয়েছে, তাদের ব্যাপারে আমরা জানলাম কিকরে বলত?

এই সব ডাইনোসর বা অন্যান্য জন্তু জানোয়ারদের কথা আমরা জানতে পেরেছি ওদের ফসিল/জীবাশ্ম থেকে। আর এই সব জীবাশ্ম আমরা পেয়েছি সেই সময়কার পাথর থেকে। আসলে চোরাবালিতে আটকে গিয়ে এইসব জীব-জন্তু মাটির তলায় তলিয়ে যায়। মাটির ভেতরে আটকে যাবার দরুন, তাদের অবশেষ আবহাওয়ার ক্ষতি বা অন্য জানোয়ারের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। এই চোরাবালি কয়েক লক্ষ্য বছর পরে ধীরে ধীরে পাথরে পরিণত হয়। আজ আমরা যখন সেইসব পাথর খুঁড়ে ফসিল বার করি, ডাইনোসরদের কথা জানতে পারি।

চোরাবালিতে এইভাবেই আটকে যায় মানুষ

চোরাবালি কোথায় আছে সেটা জানতে পারা খুব মুশকিল। অনেক সময় হয় কি, চোরাবালির ওপর শুকনো পাতা, ডালপালা পড়ে ঢেকে রাখে। অনেক সময় চোরাবালির ওপর একটা শুকনো বালির স্তর পরে যায়, যাতে বোঝা যায় না যে তার তলায় চোরাবালি আছে। চোরাবালি অনেক সময় জলের তলাতেও হতে পারে। নদী পার হবার সময় চোরাবালিতে আটকে গিয়ে মৃত্যু হতে পারে।

যদি তুমি চোরাবালিতে আটকে যাও, তাহলে কি হবে?

চোরাবালিতে আটকে গেলে, প্রথমত একদম প্যানিক করবে না। প্যানিক করে হাত পা বেশি নড়ালে আরো বেশি আটকে পরার সম্ভাবনা থাকে। একটি কথা মনে রেখো, চোরাবালির কিন্তু জলের চেয়ে অনেক বেশি ঘন। তাই চোরাবালিতে ভেসে থাকা বেশি সহজ। যদি তোমার পিঠে বা সঙ্গে কোনো ভারী বস্তু থাকে, যেমন ধর একটা ব্যাকপ্যাক, তাহলে তা ছেড়ে দেওয়া উচিত। কারণ এই ভারী বস্তুটি তোমাকে আরো বেশি দ্রুত নীচে টেনে ফেলতে পারে। বেশিরভাগ চোরাবালির গভীরতা কম হয়। খানিকটা ডোবার পরে হয়তো তোমার পা তলায় আটকে যেতে পারে। যদি তা না হয়, মানে যদি চোরাবালি খুব গভীর হয় তাহলে পুরোপুরি ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে যেমন তুমি জলে সাঁতার কাট, ঠিক সেই ভাবে, নিজের শরীরটাকে যতটা সম্ভব অনুভূমিক করে ফেলতে হবে। তারপরত খুব ধীরে ধীরে সাঁতরে চোরাবালির বাইরে আসার চেষ্টা করতে হবে।

একবার, আমেরিকার USGS এর একজন বৈজ্ঞানিক কলোরাডো নদীর তীরে চোরাবালিতে ফেঁসে গেছিলেন। তিনি তখন কোনরকমে নিজের পা ওপর দিকে নিয়ে এসে, শরীরটাকে অনুভূমিক করে, আস্তে আস্তে সাঁতরে, চোরাবালির বাইরে আসতে পেরেছিলেন। মাত্র দশ ফিট সাঁতরাতে তাঁর আট ঘন্টা সময় লেগেছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই বৈজ্ঞানিক বেঁচে যান।

ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য্যি
উলানবাতার, মঙ্গোলিয়া

ছবিঃ
বিভিন্ন ওয়েবসাইট

আঁকিবুকি

আঁকিবুকি পাতায় রয়েছে ইচ্ছামতীর বন্ধুদের আঁকা ছবি। তুমিও কি আঁকিবুকির পাতায় তোমার আঁকা ছবি দেখতে চাও? তাহলে তোমাড় আঁকা ছবি ইমেল করে পাঠিয়ে দাও ইচ্ছামতীর মেইল ঠিকানায়।

অহনা পাল
ষষ্ঠ শ্রেণী, শ্যামনগর বালিকা বিদ্যালয়, শ্যামনগর, উত্তর চব্বিশ পরগনা

অমিতৌজা ঐশী বসু
দ্বিতীয় শ্রেণী,
ফার্মিংটন উড্‌স্‌ ইন্টারন্যাশনাল ব্যাকালরিয়েট এলিমেন্টারি স্কুল, কেরি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

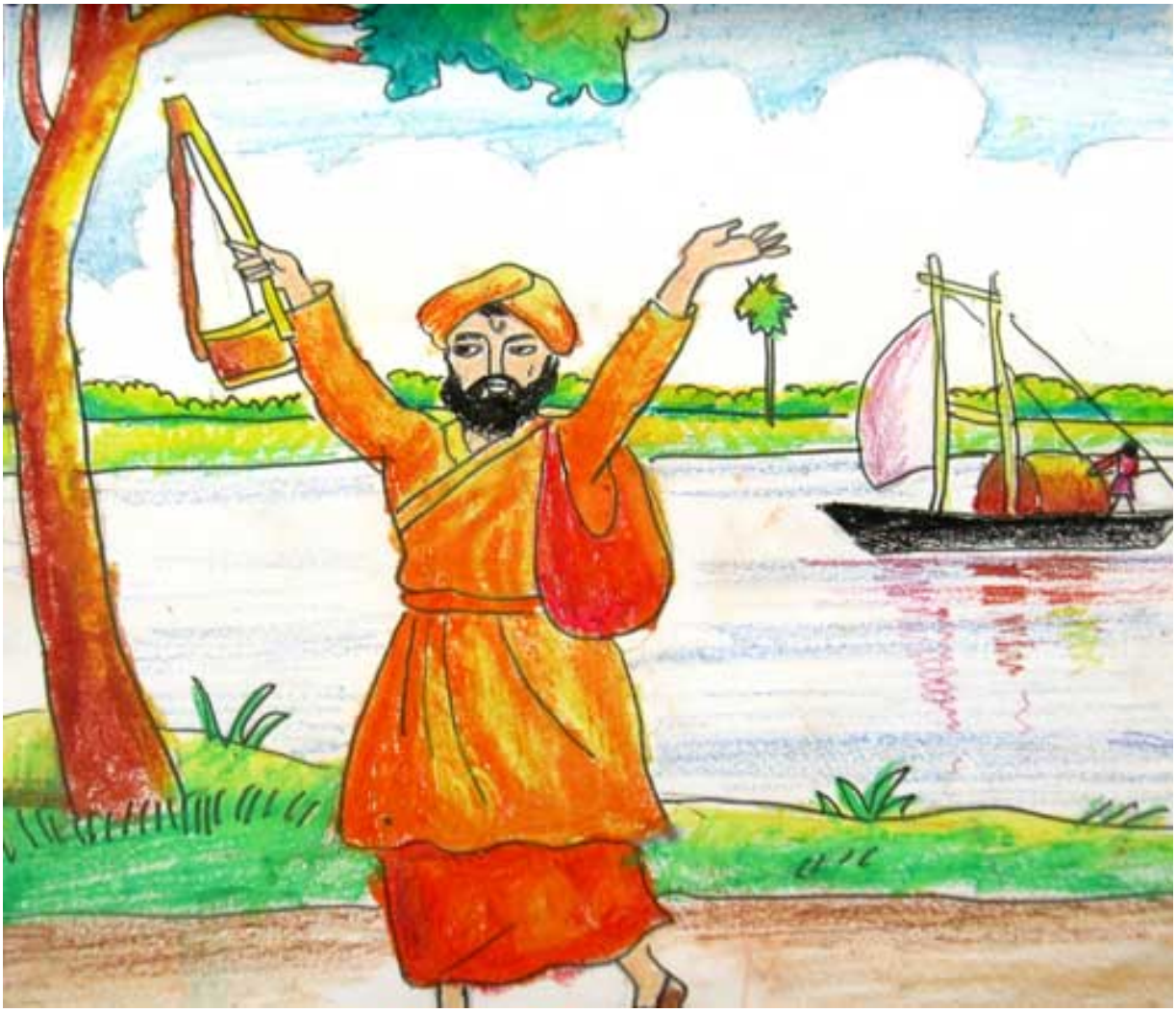

অর্কদীপ পাল
দ্বিতীয় শ্রেনী, সেন্ট অগাস্টিন স্কুল, শ্যামনগর, উত্তর চব্বিশ পরগনা

চিন্ময়ী ভট্টাচার্যি
প্রথম শ্রেণী, অর্কলন স্কুল, উলানবাতার, মঙ্গোলিয়া

মধুরিমা গোস্বামী
সপ্তম শ্রেণী, দ্য ভবানীপুর গুজরাতি এডুকেশন সোসাইটি স্কুল, কলকাতা

নীলাগ্নি দাস
দ্বিতীয় শ্রেণী, আর্মি পাবলিক স্কুল, গুয়াহাটি

শুভম গোস্বামী
তৃতীয় শ্রেণী, দ্য ভবানীপুর গুজরাতি এডুকেশন সোসাইটি স্কুল, কলকাতা

স্বাগতাশ্রী মুখোপাধ্যায়
নার্সারি ওয়ান, গার্ডেন হাই স্কুল, কলকাতা

সুদীপা কুজুর
চতুর্থ শ্রেণী, বি.ডি. মেমোরিয়াল স্কুল, কলকাতা